নির্মিতি অংশ

১. সারাংশ ও সারমর্ম

কোনো পদ্য বা গদ্যের মূলভাব বা বক্তব্যকে সংৰিপ্ত আকারে প্রকাশ করার নামই সারমর্ম বা সারাংশ। সাধারণত পদ্যের ভাব সংৰেপে প্রকাশকে সারমর্ম এবং গদ্যের বক্তব্য সংৰেপে প্রকাশ করাকে সারাংশ বলে। সারমর্ম বা সারাংশ লেখার সময় :

১. যে পাঠটুকুর সারমর্ম বা সারাংশ রচনা করতে হবে, সেটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে।
২. বাড়তি বিষয় বর্জন করতে হবে। কখনো কোনো পাঠের মূল ভাব উপমা রূ পকের আড়ালে থাকতে পারে, তা বুঝে মূল ভাব লিখতে হবে।
৩. সারাংশ বা সারমর্মে উপমা, রূ পক–এসব বাদ দিয়ে লিখতে হবে।
৪. প্রত্যৰ উক্তি বর্জন করে পরোৰ উক্তিতে লিখতে হবে।
৫. মূল অংশে উদ্ধৃতি থাকলে প্রয়োজনে সেই উদ্ধৃতির ভাবটুকু উদ্ধৃতি ছাড়া লিখতে হবে।

❑ সারাংশ

[পাঠ্য বই থেকে]

১. কোথা থেকে এসেছে আমাদের বাংলা ভাষা? ভাষা কি জন্ম নেয় মানুষের মতো? বা যেমন বীজ থেকে গাছ জন্মে তেমনভাবে জন্ম নেয় ভাষা? না, ভাষা মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয় না। বাংলা ভাষাও মানুষ বা তরুর মতো জন্ম নেয়নি, কোনো কল্পিত স্বর্গ থেকেও আসেনি। এখন আমরা যে বাংলা ভাষা বলি এক হাজার বছর আগে তা ঠিক এমন ছিল না। সে-ভাষায় এ-দেশের মানুষ কথা বলত, গান গাইত, কবিতা বানাত। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। রূপ বদলে যায় শব্দের, বদল ঘটে অর্থের। অনেকদিন কেটে গেলে মনে হয় ভাষাটি একটি নতুন ভাষা হয়ে উঠেছে। আর সে-ভাষার বদল ঘটেই জন্ম হয়েছে বাংলা ভাষার।

সারাংশ : ভাষার ধর্মই হচ্ছে বদলে যাওয়া। মানুষের মুখে মুখে বদলে যায় ভাষার ধ্বনি। শব্দেরও বদল ঘটে এবং সে সঙ্গে শব্দের অর্থেরও। হাজার বছরের পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এমনি ভাবেই আমাদের বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে।

২. আনন্দ প্রকাশ জীবনীশক্তির প্রবলতারই প্রকাশ। আনন্দকে আমরা বুঝি রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ ইত্যাদির সাহায্যে, ইন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে। মানুষ যখন আনন্দ পায় তখন সে তার মনকে প্রকাশ করতে চায়– নানা রূপে। তাই সৃষ্টি হলো চিত্রশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, সংগীতশিল্পী, কবি, সাহিত্যিক। পুরাকালের গুহামানুষ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানুষ নিজের পাওয়া আনন্দকে সুন্দরকে অন্য মানুষের মধ্যে বিস্তার করতে চেয়েছে। তাই সৃষ্টি হয়েছে নানান আঙ্গিকের শিল্পকলা।

সারাংশ : মানুষের জীবনীশক্তির প্রকাশ ঘটে আনন্দে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে আনন্দকে সে উপলব্ধি করে। সেই আনন্দানুভূতি সবার কাছে জানাতে চায়। তাই ছবি, গান, কবিতা, নাচ, ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্পকলার মাধ্যমে মানুষ তার আনন্দকে প্রকাশ করে। এই আনন্দ ও সুন্দরের বোধ মানুষের মনকে তৃপ্ত করে।

৩. বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে– 'বাঙালির বাংলা' সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। বাঙালির মতো জ্ঞান-শক্তি ও প্রেম-শক্তি (ব্রেন সেন্টার ও হার্ট সেন্টার) এশিয়ায় কেন, বুঝি পৃথিবীতে কোনো জাতির নেই। কিন্তু কর্ম-শক্তি একেবারে নেই বলেই তাদের এই দিব্যশক্তি তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাদের কর্ম–বিমুখতা, জড়তা, মৃত্যুভয়, আলস্য, তন্দ্রা, নিদ্রা, ব্যবসাবাণিজ্যে অনিচ্ছার কারণ। তারা তামসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে চেতনা–শক্তিকে হারিয়ে ফেলেছে। এই তমঃ, এই তিমির, এই জড়তাই অবিদ্যা। অবিদ্যা কেবল অন্ধকার পথে ভ্রান্তির পথে নিয়ে যায়; দিব্যশক্তিকে নিস্তেজ, মৃতপ্রায় করে রাখে।

সারাংশ : বাঙালি প্রেম-শক্তি ও জ্ঞান-শক্তিতে পৃথিবীখ্যাত। কিন্তু আলস্য তাদের দুর্বল করে রেখেছে। অলসতা আর কাজের প্রতি অনীহার জন্য তারা জগতের সবকিছু থেকে পিছিয়ে আছে। এই আলস্য ও কর্ম-বিমুখতাকে উপেৰা করে বাঙালিকে জেগে উঠতে হবে। তবেই এই বাংলা প্রকৃত অর্থে বাঙালির হবে।

৪. একজন মানুষ ভালো কি মন্দ আমরা তা বুঝতে পারি তার ব্যবহার দিয়ে। সে ভদ্র কি অভদ্র তাও বুঝতে পারি তার ব্যবহার দিয়ে। ব্যবহার ভালো হলে লোকে তাকে ভালো বলে। তাকে পছন্দ করে। ব্যবহার খারাপ হলে লোকে তাকে খারাপ বলে। তাকে অপছন্দ করে। তার সঙ্গে মিশতে চায় না। তার সঙ্গে কাজ করতে চায় না। তাকে কাছে ডাকতে চায় না। তোমার ব্যবহার দিয়েই তোমার মনুষ্যত্বের পরিচয়।

সারাংশ : সুন্দর ব্যবহারের মধ্যেই মনুষ্যত্বের পরিচয় নিহিত। মানুষের কথাবার্তা, মনোভাব ও আদব-কায়দার মধ্যে দিয়েই সুন্দর ব্যবহারের প্রকাশ ঘটে। ভালো ব্যবহার দিয়ে সহজেই অপরের ভালোবাসা পাওয়া যায়। সুন্দর স্বভাবের মধ্যেই মানুষের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।

৫. সূর্যের আলোতে রাতের অন্ধকার কেটে যায়। শিৰার আলো আমাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে। আমাদের দৃষ্টিতে চারপাশের জগৎ আরো সুন্দর হয়ে ওঠে। আমরা জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পাই; শিৰার আলো পেয়ে আমাদের ভিতরের মানুষটি জেগে ওঠে। আমরা বড় হতে চাই, বড় হওয়ার জন্য চেষ্টা করি। আমরা সুন্দর করে বাঁচতে চাই, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই। আর সুন্দর করে বাঁচতে হলে চাই জ্ঞান। সেই জ্ঞানকে কাজেও লাগানো চাই। শিৰার ফলে আমাদের ভিতর যে শক্তি লুকানো থাকে তা ধীরে ধীরে জেগে ওঠে। আমরা মানুষ হয়ে উঠি।

সারাংশ : সূর্যের আলো যেমন অন্ধকার দূর করে, তেমনি শিৰার আলো মনের অন্ধকার দূর করে দেয়। আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে শক্তি লুকানো আছে। শিৰা এ শক্তির

বিকাশে সাহায্য করে। শিৰার ফলে আমরা জ্ঞান ও দৰতা লাভ করে নিজের শক্তিকে কাজে লাগাই। যথার্থ মানুষ হয়ে উঠি।

[অতিরিক্ত অংশ]

৬. সময় ও স্রোত কাহারও অপেৰায় বসিয়া থাকে না, চিরকাল চলিতে থাকে। সময়ের নিকট অনুনয় করো, ইহাকে ভয় দেখাও, ভ্রৰেপও করিবে না। সময় চলিয়া যাইবে, আর ফিরিবে না। নষ্ট স্বাস্থ্য ও হারানো ধন পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সময় একবার গত হইয়া গেলে আর ফিরিয়া আসে না। গত সময়ের জন্য অনুশোচনা করা নিষ্ফল। যতই কাঁদ না গত সময় আর ফিরিয়া আসিবে না।

সারাংশ : সময় চিরবহমান। শত চেষ্টা করলেও সময়ের গতিকে কেউ রবদ্ধ করতে পারে না। চেষ্টা ও শ্রম দিয়ে লুপ্ত-স্বাস্থ্য বা ধ্বংস হওয়া ধন-সম্পদ পুনরায় উদ্ধার করা যেতে পারে। কিন্তু যে সময় একবার চলে যায় শত চেষ্টায়ও তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

৭. ছাত্রজীবন আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ বপনের সময়। এ সময় যে যেমন বীজ বপন করবে, ভবিষ্যৎ জীবনে সে সেরূ প ফল ভোগ করবে। এ সময় যদি আমরা নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানের অনুশীলন করে যাই তবে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় হবে। আর যদি হেলায় সময় কাটিয়ে দিই, তাহলে জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। যে শিৰা জীবন ও জীবিকার পথে কল্যাণকর, যে শিৰা মানুষকে উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে, তা-ই সর্বোৎকৃষ্ট শিৰা। ছাত্রদের জীবন গঠনে শিৰকসমাজ গুরৰত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের সুষ্ঠু পরিচালনার মধ্যে দিয়ে ছাত্রদের জীবন গঠিত হয় এবং উন্মুক্ত হয় মহত্তর সম্ভাবনার পথ। [জেএসসি– '১২]

সারাংশ : ছাত্রজীবন মানব জীবনের শ্রেষ্ঠতম সময়। ভবিষ্যত জীবনের সাফল্য এ সময়ের কর্মকাণ্ডের ওপরই নির্ভর করে। তাই ছাত্রজীবন থেকেই সুন্দর জীবন গঠনের চর্চা শুরৰ করতে হবে। ছাত্রদের জ্ঞানার্জন ও চরিত্র গঠনে শিৰকের ভূমিকা সবচেয়ে গুরৰত্বপূর্ণ। তাঁদের সঠিক নির্দেশনা পেলে শিৰার্থীর জীবন বিকশিত হয়।

৮. অভাব আছে বলিয়াই জগৎ বৈচিত্র্যময়। অভাব না থাকিলে জীব সৃষ্টি বৃথা হইতো। অভাব আছে বলিয়াই অভাব পূরণের জন্য এতো উদ্যম, এতো উদ্যোগ। আমাদের সংসার অভাবৰেত্র বলিয়াই কর্মৰেত্র। অভাব না থাকিলে সকলকেই স্থাণু, স্থবির হইতে হইতো, মনুষ্যজীবন বিড়ম্বনাময় হইতো। মহাজ্ঞানীরা জগৎ হইতে দুঃখ দূর করিবার জন্য ব্যগ্র। কিন্তু জগতে দুঃখ আছে বলিয়াই সে সেবার পাত্র যত্রতত্র সদাকাল ছড়াইয়া রহিয়াছে। যিনি অন্নদান, বস্ত্রদান, জ্ঞানদান, বিদ্যাদান করেন তিনি যেমন জগতের বন্ধু, তেমনি যিনি দুঃখে আমাদের সেবার পাত্রে অজস্র দান করিতেছেন, তিনিও মানবের পরম বন্ধু। দুঃখকে শত্রৰ মনে করিও না, দুঃখ আমাদের বন্ধু।

সারাংশ : অভাব বা প্রয়োজনের কারণেই মানুষ নানা কিছু সৃষ্টি করে। আর সৃষ্টির প্রেরণাই মানুষের কাজের উৎস। অভাব না থাকলে মানুষ অলস ও উদ্যমহীন হয়ে যেত। দুঃখ আছে বলেই মহামানবগণ সেবার হাত প্রসারিত করেন। দুঃখে যিনি এগিয়ে আসেন, তিনি মানবের পরম বন্ধু। দুঃখের আগুনে পুড়েই মানুষ খাঁটি সোনা হয়। তাই দুঃখকে শত্রৰ ভাবা ঠিক নয়।

৯. বিদ্যা মানুষের মূল্যবান সম্পদ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু চরিত্র তদপেৰাও অধিকতর মূল্যবান। অতএব কেবল বিদ্বান বলেই কোনো লোক সমাদর লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। চরিত্রহীন ব্যক্তি যদি নানা বিদ্যায় আপনার জ্ঞান-ভান্ডার পূর্ণ করেও থাকে তথাপি তার সঙ্গ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। প্রবাদ আছে যে, কোনো কোনো বিষধর সাপের মস্তকে মণি থাকে। মণি মূল্যবান বটে কিন্তু তাই বলে যেমন মণি লাভের নিমিত্ত বিষধর সাপের সাহচর্য বুদ্ধিমানের কাজ নয়, সেরূ প বিদ্যা আদরণীয় বিষয় হলেও বিদ্যা লাভের নিমিত্তে দুর্জন বিদ্বানের নিকট গমন করা বিধেয় নয়। কেননা, দুর্জনের সাহচার্যে আপনার নিষকলুষ চরিত্রও কলুষিত হতে পারে এবং এরূ পে মানব-জীবনের অমূল্য সম্পদ নষ্ট হতে পারে।

সারাংশ : চরিত্র মানব-জীবনের অমূল্য সম্পদ। এটি বিদ্যার চেয়েও মূল্যবান। মাথায় মণি থাকলেও সাপ যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি চরিত্রহীন ব্যক্তি বিদ্বান হলেও তার সাহচর্য বর্জনীয়। এতে নিজের চরিত্র কলঙ্কিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

১০. খুব ছোট ছিদ্রের মধ্যদিয়ে যেমন সূর্যকে দেখা যায়, তেমনি ছোট ছোট কাজের ভেতর দিয়েও কোনো ব্যক্তির চরিত্রের পরিচয় ফুটে ওঠে। বস্তুত মর্যাদাপূর্ণভাবে ও সুচারৰূ পে সম্পন্ন ছোট কাজেই চরিত্রের পরিচয়। অন্যের প্রতি আমাদের ব্যবহার কীরূ প তা-ই হচ্ছে আমাদের চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরীৰা। বড়, ছোট ও সমতুল্যের প্রতি সুশোভন ব্যবহার আনন্দের নিরবচ্ছিন্ন উৎস।

সারাংশ: চরিত্রের মধ্য দিয়েই মানুষের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশিত হয়। ছোট ছোট সৎকাজের ভেতর দিয়ে মানুষের মনের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। ছোট–বড় সবার সাথে সুন্দর ব্যবহার আমাদের জীবনকে সুন্দর করে।

১১. অপরের জন্য তুমি প্রাণ দাও, আমি তা বলতে চাইনে। অপরের ক্ষুদ্র দুঃখ তুমি দূর করো। অপরকে একটুখানি সুখ দাও। অপরের সঙ্গে একটুখানি মিষ্টি কথা বলো। পথের অসহায় মানুষটির দিকে একটু করৰণ চাহনি নিৰেপ করো, তাহলেই অনেক হবে। চরিত্রবান, মানবতাসম্পন্ন মানুষ নিজের চেয়ে পরের অভাবে বেশি অধীর হন, পরের দুঃখকে ঢেকে রাখতে গৌরববোধ করেন।

সারাংশ : মানুষের জন্য অনেক বড় কিছু করতে না পাড়লেও ছোট ছোট কাজের দ্বারাও আমরা মানুষের উপকারে আসতে পারি। সাধ্যমতো সহায়তা দিয়ে অন্যের মনে আশার সঞ্চার করতে পারি। মানবিক অচরণ দিয়ে অসহায় মানুষকে সান্ত্বনা দিতে পারি। এভাবেই মহৎ মানুষেরা তাঁদের মহত্ত্বের পরিচয় দেন।

১২. মুখে অনেকেই টাকা অতি তুচ্ছ, অর্থ অনর্থের মূল বলে থাকেন। কিন্তু জগৎ এমনি ভয়ানক স্থান যে, টাকা না থাকলে তার স্থান কোথাও নেই– সমাজে নেই, স্বজাতির নিকট নেই, ভ্রাতা-ভগিনীর নিকট নেই, স্ত্রীর নিকট নেই। স্ত্রীর ন্যায় ভালোবাসে–বল তো জগতে কে আর আছে? টাকা না থাকলে অমন অকৃত্রিম ভালোবাসারও আশা নেই, কারো নিকট সম্মান নেই। টাকা না থাকলে রাজায় চিনে না, সাধারণে মান্য করে না, বিপদে জ্ঞান থাকে না।

জন্মমাত্র টাকা, জীবনে টাকা, জীবনান্তেও টাকা, জগতে টাকারই খেলা।

সারাংশ : পৃথিবীতে অর্থের চেয়ে মূল্যবান কিছু নেই। যার অর্থ নেই সমাজ সংসারে কোথাও তার মূল্য নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত টাকাই মানুষের ভাগ্যের মূল নিয়ন্তা।

❑ সারমর্ম

[পাঠ্য বই থেকে]

১. নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ,
স্তব্ধ অতল দিঘি কালোজল– নিশীথশীতল স্নেহ।
বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে –
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।

সারমর্ম : মা ও মাতৃভূমি সবার কাছে প্রিয়। বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি-এর আকাশ-বাতাস, নদী, মাঠ, প্রকৃতি-নিসর্গ, মানুষ সবই আমাদের ভালোবাসার ধন। বাংলার আবহমান অপরূপ রূপে প্রতিটি বাঙালিই মোহমুগ্ধ।

২. ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো, পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম-আঁটা জামার নিচে শান্তিতে শয়ান।
দেখা হলেই মিষ্ট অতি,
মুখের ভাব শিষ্ট অতি,
অলস দেহ ক্লিষ্ট গতি,
গৃহের প্রতি টান–
তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রা রসে ভরা
মাথায় ছোটো বহরে বড় বাঙালি সন্তান।
ইহার চেয়ে হতাম যদি আরব বেদুইন
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন।
ছুটছে ঘোড়া উড়েছে বালি,
জীবনস্রোত আকাশে ঢালি
হৃদয়-তলে বহ্নি জ্বালি চলেছি নিশিদিন–
বরশা হাতে, ভরসা প্রাণে,
সদাই নিরুদ্দেশ
মরুর ঝড় যেমন বহে সকল বাধা-হীন।

সারমর্ম : বাঙালি শান্তশিষ্ট, কর্মহীন, আরামপ্রিয় ও অলস জাতি। এ জীবন কারো কাম্য হতে পারে না। তার চেয়ে সাহসী, কর্মী ও চঞ্চলতা-মুখর জীবনের অধিকারী হওয়া অনেক বেশি সম্মানের।

৩. এই যে বিটপি-শ্রেণি হেরি সারি সারি–
কি আশ্চর্য শোভাময় যাই বলিহারি!
কেহ বা সরল সাধু-হৃদয় যেমন,
ফল-ভারে নত কেহ গুণীর মতন।
এদের স্বভাব ভালো মানবের চেয়ে,
ইচ্ছা যার দেখ দেখ জ্ঞানচৰে চেয়ে।
যখন মানবকুল ধনবান হয়,
তখন তাদের শির সমুন্নত রয়।
কিন্তু ফলশালী হলে এই তরুগণ,
অহংকারে উচ্চশির না করে কখন।
ফলশূন্য হলে সদা থাকে সমুন্নত,
নীচ প্রায় কার ঠাঁই নহে অবনত।

সারমর্ম : গাছ ফলে পরিপূর্ণ হয়ে নত হয়। তাতে তার গৌরব থাকলেও অহংকার থাকে না। কিন্তু মানুষের অর্থ হলেই অহংকার, অর্থ ফুরিয়ে গেলেই মাথা নিচু হয়। গাছ ফলশূন্য হলেও কিন্তু মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে থাকে। নীচ স্বভাবের মানুষের মতো সে কারো কাছে অবনত হয় না।

৪. সাম্যের গান গাই–
আমার চৰে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা-কিছু এল পাপ-তাপ বেদনা অশ্রুবারি
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
জগতের যত বড় বড় জয় বড় বড় অভিযান
মাতা ভগ্নী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান।
কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর, লেখা নাই তার পাশে।
কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারি,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়-লক্ষ্মী নারী।

সারমর্ম : মানবসভ্যতা নির্মাণে নারী ও পুরুষের সমান অবদান রয়েছে। কিন্তু ইতিহাসে পুরুষের কথা যতটা লেখা হয়েছে, নারীর ততটা হয়নি। নারীকে তার কর্ম-স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এখন দিন এসেছে সম-অধিকারের। নারী-পুরুষ সবাইকে সুন্দর ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

[অতিরিক্ত অংশ]

৫. হে সূর্য! শীতের সূর্য!
হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীৰায়
আমরা থাকি
যেমন প্রতীৰা করে থাকে কৃষকের চঞ্চল চোখ
ধানকাটার রোমাঞ্চকর দিনগুলির জন্যে।
হে সূর্য, তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!
সারারাত খড়কুটো জ্বালিয়ে
এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কত কষ্টে আমরা শীত আটকাই!
সকালের এক টুকরো রোদ্দুর–
এক টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামি।

সারমর্ম : সূর্যের শক্তিতে ভূ-পৃষ্ঠে গাছপালা, জীব-জন্তু ও মানুষ জীবনধারণ করে। প্রচণ্ড শীতে সূর্যের একটু উত্তাপের জন্য সারারাত অপেৰা করে বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন শীতার্ত মানুষ। সমাজের অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত এসব মানুষের কাছে সূর্যের উষ্ণতা সোনার চেয়েও মূল্যবান।

৬. সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মা গো, তোমার ভালোবেসে॥
জানি নে তোর ধনরতন আছে কি না রানির মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে॥
কোন বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে॥

আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে॥

সারমর্ম : ধন-রত্নে পূর্ণ না থাকলেও মাতৃভূমি প্রতিটি মানুষের কাছেই প্রিয়। স্বদেশ মানুষের মনে পূর্ণতা এনে দেয়। এজন্যই মানুষ দেশের মাটিতেই শেষ আশ্রয়টুকু চায়।

৭. পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মতো সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ;
'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদ না আর,
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে
ততই বাড়িবে হৃদয় ভার।
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।

সারমর্ম : ত্যাগের মধ্যেই প্রকৃত সুখ নিহিত। অন্যকে বাদ দিয়ে কেউ একা চলতে পারে না। সব মানুষেরই দায়িত্ব অন্যের আনন্দ-বেদনাকে নিজের বলে গ্রহণ করা। পারিস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সুখী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

৮. জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে
সে জাতির নাম মানুষ জাতি;
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত
একই রবি শশী মোদের সাথি।
শীতাতপ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা
সবাই আমরা সমান বুঝি,
কচি কাঁচাগুলো ডাঁটো করে তুলি
বাঁচিবার তরে সমান যুঝি।
দোসর খুঁজি ও বাসর বাঁধি গো,
জলে ডুবি, বাঁচি পাইলে ডাঙা,
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবারই সমান রাঙা।

সারমর্ম : জাতি, ধর্ম, গাত্রবর্ণ ইত্যাদিতে পার্থক্য থাকলেও এ সকল পরিচয়ের ঊর্ধ্বে হচ্ছে মানুষ জাতি। সব মানুষের অনুভূতিই সমান। মানুষে মানুষে পার্থক্য করা তাই অযৌক্তিক। সকলের অনুভূতিকে মূল্য দিয়ে একসঙ্গে জীবন যাপন করলেই পৃথিবী সুন্দর হবে।

৯. ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল
গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল।
মুহূর্ত নিমেষ কাল, তুচ্ছ পরিমাণ,
রচে যুগ-যুগান্তর-অনন্ত মহান,
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ পথে ঘটায় প্রমাদ।
প্রতি করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী,
–এ ধরায় স্বর্গ শোভা নিত্য দেয় আনি।

সারমর্ম : পৃথিবীর কোনো কিছুই তুচ্ছ নয়। ছোট ছোট বালুকণা যেমন মহাদেশ তৈরি করে, তেমনি বিন্দু বিন্দু জল মহাসাগরের জন্ম দেয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুহূর্তের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় যুগ–যুগান্তরের। সামান্য অপরাধের পথ ধরেই আসে মহাপাপ। আবার সামান্য একটু করুণা ও স্নেহের বাণী এ পৃথিবীতে স্বর্গসুখ এনে দিতে পারে।

১০. কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক? কে বলে তা বহুদূর?
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক– মানুষেতে সুরাসুর–
রিপুর তাড়নে যখন মোদের বিবেক পায়গো লয়,
আত্মগ্লানির নরক অনলে তখনি পুড়িতে হয়।
প্রীতি ও প্রেমের পূণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে।

সারমর্ম : স্বর্গ বা নরক দূরে কোথাও নয় বরং মানুষের মাঝেই বিরাজ করে। খারাপ কাজ করে মানুষ যখন অনুতপ্ত হয়ে যন্ত্রণায় ভোগে, তখন সেটাই নরকযন্ত্রণা। পরস্পরের প্রতি বিভেদ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বে মানুষ এই পৃথিবীকে নরকে পরিণত করে। যখন সব বৈরিতা ভুলে একে অন্যকে বিশুদ্ধভাবে ভালোবাসে, তখনই পৃথিবীতে নেমে আসে স্বার্গীয় সুখ।

১১. আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সেই পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইলো যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান!

সারমর্ম : পৃথিবীর যত উন্নতি সবই শ্রমজীবী মানুষের দান। তাদের নিরলস সেবা ও শ্রমের কল্যাণেই আমরা সুখী জীবন যাপন করি। অথচ তাদের এই শ্রমের মূল্য আমরা দিই না, তাদের দুঃখ-বেদনা অনুভব করতে চাই না। শ্রমজীবী এই মানুষেরাই সভ্যতার অগ্রযাত্রার মূল কারিগর। তারাই প্রকৃত শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা আমাদের কর্তব্য।

১২. বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা–
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিত্তে নাই–বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়॥

সারমর্ম : কবি সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন না। কবি কামনা করেন, তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি যেন যথাযথভাবে পালন করতে পারেন। বিপদ হতে রক্ষা, দুঃখে সান্ত্বনা, কর্মের ভার লাঘব ইত্যাদি তাঁর প্রত্যাশিত নয়। কবির কামনা বিপদে, দুঃখে, ভয়ে তাঁর মনোবল যেন অটুট থাকে।

২. ভাব-সম্প্রসারণ

কবি-সাহিত্যিকদের লেখায় কখনো কোনো একটি বাক্যে বা কবিতার এক বা একাধিক চরণে গভীর কোনো ভাব নিহিত থাকে। সেই ভাবকে বিস্তারিতভাবে লেখা, বিশেরষণ করাকে ভাবসম্প্রসারণ বলে। যে ভাবটি কবিতার চরণে বা বাক্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়। সাধারণত সমাজ বা মানবজীবনের মহৎ কোনো আদর্শ বা বৈশিষ্ট্য, নীতি-নৈতিকতা, প্রেরণামূলক কোনো বিষয় যে পাঠে বা বাক্যে বা চরণে থাকে, তার ভাবসম্প্রসারণ করা হয়। ভাবসম্প্রসারণের ৰেত্রে রূ পকের আড়ালে বা প্রতীকের ভেতর দিয়ে যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়, তাকে যুক্তি, উপমা, উদাহরণ ইত্যাদি সাহায্যে বিশেরষণ করতে হয়।

ভাবসম্প্রসারণ করার ৰেত্রে যেসব দিক বিশেষভাবে খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

১. উদ্ধৃত অংশটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে।
২. অন্তর্নিহিত ভাবটি বোঝার চেষ্টা করতে হবে।
৩. অন্তর্নিহিত ভাবটি কোনো উপমা-রূ পকের আড়ালে নিহিত আছে কি না, তা চিন্তা করতে হবে।
৪. সহজ-সরলভাবে মূল ভাবটিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে।
৫. মূল বক্তব্যকে প্রকাশরূ প দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে।
৬. বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

[পাঠ্য বই থেকে]

১

এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

ভাব-সম্প্রসারণ : মানুষ স্বভাবতই যত পায়, তত চায়। তার চাওয়ার শেষ নেই। এ জগতে যার যত বেশি আছে, সে তত আরো বেশি চায়। যে লাখ টাকার মালিক, সে কোটিপতি হতে চায়। যার কোটি আছে, সে হাজার কোটি পেতে চায়। রাজার বিপুল সম্পদ আছে। তবুও তার রাজ্য জয়ের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। কেননা তার আরো সম্পদ চাই। আরো ভোগ, আরো বিলাসিতা প্রয়োজন তার। এই আরো পাওয়ার ইচ্ছা মানুষকে অমানুষ করে তোলে। নিজের মানবতাকে বিসর্জন দিয়ে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তারা গরিবের সর্বস্ব কেড়ে নেয়। তারা তাদের ভোগ-লালসা মেটাতে গরিবের সামান্য সম্পদ আত্মসাৎ করে নিজেরা ফুলে-ফেঁপে ওঠে। ধনীদের এই লোভে সমাজের দীনহীন গরিব মানুষগুলো প্রতিনিয়ত হচ্ছে প্রতারিত; সহায়-সম্বলহীন পথের ফকির। এতে ধনীদের মনে সামান্যতম করুণাও হয় না।

২

করিতে পারি না কাজ
সদা ভয়, সদা লাজ
সংশয়ে সংকল্প সদা টলে
পাছে লোকে কিছু বলে।

ভাব–সম্প্রসারণ : মানুষের জীবন কর্মমুখর। কাজের মাধ্যমেই মানবজীবনের সফলতা আসে। কাজ করতে গেলে ভুল হয় এবং ভুল থেকে শিৰা গ্রহণ করে মানুষ তার জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এ পৃথিবীতে সবাই কর্মী নয়। কিছু অলস-অকর্মণ্য মানুষ আছে, যারা সব সময় অন্যের পেছনে লেগে থাকে। তাদের কাজের খুঁত ধরে, অন্যায় সমালোচনা করে। ফলে অনেক সময় কোনো কাজ করতে গেলে কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্ত হয়। কে কী মনে করবে, কে কী সমালোচনা করবে এই সব ভেবে তারা বসে থাকে। যার জন্য কাজ এগোয় না। তাই যারা সমাজে অবদান রাখতে চায় তাদের দ্বিধা করলে চলবে না। দৃঢ় মনোবল নিয়ে লোকলজ্জা ও সমালোচককে উপেৰা করতে হবে। মানুষের কল্যাণে মহৎ কাজ করতে হলে ভয়ভীতি সংকোচকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

৩

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির–কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

ভাব–সম্প্রসারণ : মানব–সভ্যতা বিকাশে নারী ও পুরুষের সমান অবদান রয়েছে। নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠেছে আমাদের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি। সৃষ্টিকর্তা নারী ও পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন একে অপরের পরিপূরক হিসেবে। তাই নারী ও পুরুষ চিরকালের সার্থক সঙ্গী। একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সৃষ্টির আদিমকাল থেকে নারী পুরুষকে জুগিয়েছে প্রেরণা, শক্তি ও সাহস। আর পুরুষ বীরের মতো সব কাজে অর্জন করেছে সাফল্য। আজ পর্যন্ত বিশ্বে যত অভিযান সংঘটিত হয়েছে, তার অন্তরালে নারীর ভূমিকাই মুখ্য। সঙ্গত কারণেই নারী ও পুরুষের কার্যৰেত্রে ভিন্নতা আছে। তবুও নারী যেমন পুরুষের উপর নির্ভরশীল, পুরুষও তেমনি নারীর মুখাপেৰী। নারীকে বাদ দিয়ে পুরুষের জীবন অসম্পূর্ণ, অর্থহীন। নারী ও পুরুষের মিলনের মধ্যেই রয়েছে জগতের সমস্ত কল্যাণ। উভয়ের দানে পুষ্ট হয়েছে আমাদের পৃথিবী।

৪

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।

ভাব–সম্প্রসারণ : পৃথিবীর সকল দেশেরই জাতীয় জীবনে এমন দু-একটি দিন আসে যা স্বমহিমায় উজ্জ্বল। আমাদের জাতীয় জীবনে এমনি স্মৃতি-বিজড়িত মহিমা-উজ্জ্বল একটি দিন একুশে ফেব্রুয়ারি। সারা বিশ্বের বাংলা ভাষীদের কাছে এ দিনটি চির-স্মরণীয়। একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাস একদিকে আনন্দের, অন্যদিকে বেদনার। পাকিস্তানি স্বৈর-শাসকরা বাঙালির মুখ থেকে বাংলা ভাষা কেড়ে নিতে চেয়েছিল ১৯৪৮ সালে। বাংলার মানুষ সে অন্যায় মেনে নেয়নি। বাংলার দামাল ছেলেরা তুমুল বিরোধিতা করে রাজপথে নেমে আসে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবিতে বাংলার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তোলে। স্বৈরাচারী পাক-সরকার আন্দোলন দমনের জন্য শুরু করে গ্রেফতার, জুলুম, নির্যাতন। এতেও বাংলার দুরন্ত ছেলেদের দমাতে না পেরে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তাদের মিছিলে নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করে। রফিক, শফিক, বরকত, জব্বার, সালামের রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয়। বাংলা পায় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। আর সমগ্র বাঙালির চেতনায় চিরস্মরণীয় ও বরণীয় থাকে ভাষা–শহিদদের নাম। তাঁদের ঋণ আমরা কোনোদিন ভুলব না।

৫

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে, চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন নদে?

ভাব–সম্প্রসারণ : মানুষ মরণশীল। মানুষ অমর নয়। একদিন সবাইকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যুই জীবনের অনিবার্য পরিণতি। মৃত্যুকে ঠেকানোর ৰমতা কোনো মানুষের নেই। মানবজীবন নদীর জলের মতো প্রবহমান। নদীর জোয়ার-ভাটার মতো মানুষের জীবনেও সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন আছে। জাগতিক নিয়মেই জীবন চলে। এটাই প্রকৃতির বিধান। তাই মৃত্যুকে অযথা ভয় পাবার কিছু নেই। বরং এই সত্যকে মেনে নিয়ে মানবজীবনকে সার্থক করে তুলতে হবে। কর্মগুণে সমাজ-সভ্যতায় নিজের কীর্তির চিহ্ন রেখে যেতে হবে। নিষ্ফল জীবনের অধিকারী মানুষকে কেউ মনে রাখে না। কিন্তু কৃতী লোকের গৌরব জীবনের সীমা অতিক্রম করে অমরতা ঘোষণা করে। মানুষেরও শরীরের মৃত্যু হয়। কিন্তু তার জীবনের পুণ্যকর্ম পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। নশ্বর মৃত্যুও মানুষের জীবনে তখন অবিনশ্বর হয়ে ওঠে।

৬

বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

ভাব–সম্প্রসারণ : বাঙালি জাতির সবচেয়ে গৌরবের ইতিহাস অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার ইতিহাস। বাঙালি জাতি কারো অধীনতা কোনোদিন মেনে নেয়নি। অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির অবস্থান চিরকালই ছিল বজ্রকঠিন। তাই এখানে বারবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের জাঁতাকলে প্রায় দুশো বছর ধরে নিষ্পেষিত হয়েছে এ জাতি। ১৯৪৭-এ সেই জাঁতাকল থেকে এ উপমহাদেশের মানুষ মুক্তি পেলেও বাঙালির মুক্তি মেলেনি। এ বন্ধন বাঙালি মেনেও নেয়নি। ১৯৫২ সালের রক্তঝরা ভাষা-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় মুক্তি-সংগ্রামের দিকে। ১৯৫৮ ও ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানি সামরিক শাসক বাংলার দামাল ছেলেদের ওপর গুলি চালায়। গুলি করে ১৯৬৯–এর গণঅভ্যুত্থানেও। বারবার বাঙালির বুকের রক্তে রঞ্জিত হয় রাজপথ। তবুও তাদের স্বাধীনতার দাবিকে ঠেকাতে ব্যর্থ হয় পাকিস্তানি জান্তা–বাহিনী। তাই তারা ১৯৭১-এ বাঙালির ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানে। তখন বাংলার মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তি–সংগ্রামে। লৰ লৰ মানুষের বুকের রক্তে বাংলার মাটি লাল হয়। অবশেষে অর্জিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

৭

সঙ্গদোষে লোহা ভাসে।

ভাব–সম্প্রসারণ : প্রত্যেক মানুষই তার জীবন পরিচালনার ৰেত্রে একটি স্বাধীন সত্তা বহন করে। সে একাই তার বিবেককে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে এৰেত্রে তার সঙ্গের প্রভাব বিশেষভাবে লৰণীয়। ভবিষ্যতের সুন্দর বা খারাপের বিষয়টি নির্ভর করে ব্যক্তির ইচ্ছা বা সঙ্গ নির্বাচনের ওপর। যেসব মানুষ উন্নত চরিত্র বা সৎ–স্বভাবের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে, তাদের স্বভাব–চরিত্রও সুন্দর ও বিকশিত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে যারা কুসঙ্গে বা কুসংসর্গে থেকে নিজেদের চরিত্রের অধঃপতন ঘটিয়েছে, সমাজে তাদের বিপর্যয় অনিবার্য। তাই মানবজীবনে সঙ্গ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকৃতিতেও যেসব বস্তু সুন্দর ও রমণীয়, সেগুলোর সংস্পর্শে যেসব বস্তু থাকে তারাও সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। খারাপ বস্তুটি সুন্দর বস্তুটির গুণ নিজের মধ্যে ধারণ করে অন্যের কাছে নিজেকে মর্যাদাবান ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। প্রকৃতপৰে, সঙ্গই সৃষ্টিকে মহিমান্বিত করে তোলে। আর এজন্য সঙ্গই হলো সবকিছুর সাফল্য ও বিফলতার চাবিকাঠি।

৮

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

ভাব–সম্প্রসারণ : লোভ মানুষের পরম শত্রু। লোভ মানুষকে অন্ধ করে; তার বিবেক বিসর্জন দিয়ে তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। লোভের বশবর্তী হয়েই মানুষ জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে। মানুষ নিজের ভোগের জন্য যখন কোনো কিছু পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করে তাকে লোভ বলে। তখন যা নিজের নয়, যা পাওয়ার অধিকার তার নেই, তা পাওয়ার জন্য মানুষ লোভী হয়ে ওঠে। সে তার ইচ্ছাকে সার্থক করে তুলতে চায়। লোভের মোহে সে সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ সব বিসর্জন দেয়। তার ন্যায়-অন্যায় বোধ লোপ পায়। সে পাপের পথে ধাবিত হয়। নিজের স্বার্থের জন্য অন্যের সর্বনাশ করে। এভাবে লোভ মানুষকে পশুতে পরিণত করে। ডেকে আনে মৃত্যুর মতো ভয়াবহ পরিণাম। জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলার জন্য লোভ বর্জন করা উচিত।

৯

জ্ঞানহীন মানুষ পশুর সমান।

ভাব–সম্প্রসারণ : সৃষ্টির অন্যান্য প্রাণীর থেকে মানুষকে আলাদা করেছে তার বিবেক বা জ্ঞান, যা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই জ্ঞান বা বিবেক সুপ্ত অবস্থায় থাকে। অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে জাগিয়ে তুলতে হয়। জ্ঞান মানুষকে যোগ্যতা দান করে। নানা বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলে। জ্ঞানের আলোকেই মানুষের জীবন বিকশিত হয়ে ওঠে। তাই মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য জ্ঞানের সহায়তা অপরিহার্য। অন্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য এখানেই। জ্ঞানবান মানুষ কখনো খারাপ কাজ করতে পারে না। তার বিবেক তাকে খারাপ আচরণ করতে বাধা দেয়। অপরদিকে জ্ঞানহীন মানুষ পশুর মতো নির্বোধ। পশুর যেমন জ্ঞান নেই। সে ন্যায়-অন্যায় বোঝে না। আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। অজ্ঞান ব্যক্তিরও তেমনি কোনো বিবেক নেই। জ্ঞানের অভাবে তারা আধুনিক জীবনের সম্পূর্ণ স্বাদ উপভোগ করতে পারে না। তাদের জীবনের সঙ্গে পশুর জীবনের কোনো পার্থক্য নেই। জ্ঞানই মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টেনে দেয়। তাই মানুষকে সব সময় জ্ঞানসাধনায় নিয়োজিত থাকা দরকার।

১০

একতাই বল।

ভাব–সম্প্রসারণ : মানুষ পারিবারিক জীব। পরিবারের প্রত্যেকে একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এই পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতা থেকে গড়ে উঠেছে মানবসমাজ; মানুষের একতাবোধ। তাই মানবজীবনের অস্তিত্বের সঙ্গে একতার গভীর সম্পর্ক। মানুষকে সব সময় প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে জীবনযাপন করতে হয়। তার শত্রুর শেষ নেই। প্রতিকূল পরিবেশে শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য মানুষের দরকার সংঘবদ্ধ শক্তির। একতাবদ্ধ জীবনে আছে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। ঐক্যবদ্ধ জাতিকে কোনো শক্তিই পদানত করতে পারে না। একতার কল্যাণ প্রতিফলিত হয় ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনেও। একজনে যে কাজ করতে পারে, দশজনে তার বহুগুণ কাজ করা সম্ভব। এভাবে জাতি একতার গুণে বড় হয় । আজকের বিশ্বে যারা উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে পরিচিত তারা নিজেদের মধ্যে সব ভেদাভেদ ভুলে জাতীয় ঐক্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। যে জাতি ঐক্যবদ্ধ নয়, সে জাতির উন্নতি অসম্ভব। ব্যক্তির ৰেত্রে বন্ধুবান্ধবহীন নিঃসঙ্গ জীবন যেমন বিভ্রান্তিকর, তেমনি একতাহীন জাতির ধ্বংস অনিবার্য। ব্যক্তিজীবনের স্বার্থে, জাতীয় জীবনের কল্যাণে এবং মানবজাতির মঙ্গলের জন্য মানুষের একতাবদ্ধ থাকা একান্তই অপরিহার্য।

[অতিরিক্ত অংশ]

১১

পিতামাতা গুরৰজনে দেবতুল্য জানি,
যতনে মানিয়া চল তাহাদের বাণী।

মূলভাব : বাবা, মা ও অভিভাবকবৃন্দ আমাদের জীবন গঠন ও পরিচালনার জন্য যেসব উপদেশ দেন, সেগুলো মেনে চলা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

সম্প্রসারিত ভাব : পিতা-মাতা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। অনেক কষ্ট করে তাঁরা আমাদের লালন-পালন করেন। পিতা-মাতার সঙ্গে অন্য গুরৰজনরাও আমাদের সুস্থ জীবন বিকাশে সহায়তা করেন। তাঁরা আমাদের স্নেহ করেন, ভালোবাসেন এবং সর্বদাই মঙ্গল কামনা করেন। এঁরা সবাই বয়সে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, প্রজ্ঞায় আমাদের থেকে অনেক বড়। অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁরা জানেন কী করলে আমাদের ভালো হবে। আর কোন পথটি আমাদের জন্য ৰতিকর। নবীনতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে এই কঠিন ও জটিল পৃথিবীর অনেক কিছুই আমাদের অজানা। সে জন্য পিতা–মাতা, গুরৰজন ও বিশ্বের মহান ব্যক্তিদের উপদেশ চলার পথের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর তা অবহেলা করলে জীবনে সফলতা আসবে না। প্রতি মুহূর্তেই আমরা হোঁচট খাব। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বায়েজিদ বোস্তামি গুরৰজনদের আদেশ-উপদেশ শ্রদ্ধাভরে পালন করেছেন। আর সে কারণেই তাঁরা সকলের শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হতে পেরেছেন। তাই পিতা-মাতা, গুরৰজন আদর্শস্থানীয়, দেবতুল্য এবং আরাধনাযোগ্য। তাঁদের বাণী অনুসরণ করে নিজের জীবন গড়তে হবে এবং দেশ, জাতি তথা সমগ্র বিশ্বকে শাশ্বত কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

মন্তব্য : পিত-মাতা, গুরৰজন ও বিশ্বের মহান ব্যক্তিদের উপদেশ মানলে নিজের জীবন সুন্দর ও বিকশিত হবে এবং দেশ ও জাতি উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারবে।

১২

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।

মূলভাব : কাজই মানুষের পরিচয়কে ধারণ করে। তাই মুখে বড় বড় কথা বলার পরিবর্তে কাজে মনোনিবেশ করলে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধিত হবে।

সম্প্রসারিত ভাব : আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা অনেক কথা বলতে ভালোবাসে কিন্তু কাজের সময় ফাঁকি দেয়। আবার অন্যের সমালোচনা করার বেলাতেও তারা অত্যন্ত পটু। এসব মানুষ সমাজের জন্য ৰতিকর। তারা সভ্যতার বিকাশে কোনো ভূমিকা রাখে না বরং এর অগ্রযাত্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নিজে কাজ করলে এবং অন্যের কাজে সহায়তা করলে আমাদের দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। বিশ্বের সব দেশেই শ্রমকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। মহামানবদের জীবনী পাঠ করলে দেখা যায়, তাঁরা কর্ম ও নিষ্ঠা দিয়ে পৃথিবীতে নিজেদের নাম স্মরণীয় করে রেখেছেন। এখন থেকে চার দশকেরও অধিক সময় আগে নিল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স ও এডউইন অলড্রিন– এই তিনজন মানুষ ঐকান্তিক সাধনা, নিরলস শ্রম ও কঠোর অধ্যবসায়ের ফলে চাঁদে অবতরণ করতে পেরেছিলেন। এই দুঃসাহসী কাজের জন্য তাঁরা আজও মানুষের কাছে বরণীয় হয়ে আছেন। এই কাজের মধ্য দিয়ে তাঁরা বিজ্ঞানকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদেরও উচিত তাঁদের পথকে অনুসরণ করে ভালো ও পুণ্যকর্ম করে নিজের, পরিবারের তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করা। অর্থহীন কথা পরিহার করে কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াতেই নিজের ও দেশের উন্নতি নিশ্চিত করা যায়।

মন্তব্য : আত্মম্ভরিতা পরিত্যাগ করে কাজ ও পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে।

১৩

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?

মূলভাব : মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষ যে কোনো কিছুর প্রকৃত রসাস্বাদন করতে পারে এবং এই ভাষাতেই তার প্রাণের স্ফূর্তি ঘটে।

সম্প্রসারিত ভাব : পৃথিবীর প্রায় সব জাতিরই নিজস্ব ভাষা আছে এবং এক ভাষা থেকে অন্য ভাষা আলাদা। ভাষার মাধ্যমে আমরা শুধু নিজের মনের ভাবই অন্যের কাছে প্রকাশ করি না, মাতৃভাষার সাহায্যে অন্যের মনের কথা, সাহিত্য–শিল্পের বক্তব্যও নিজের মধ্যে অনুভব করি। নিজের ভাষার কিছু বোঝা যত সহজ, অন্য ভাষায় তা সম্ভব নয়। বিদেশে গেলে নিজের ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায় আরও প্রবলভাবে। তখন নিজের ভাষাভাষী মানুষের জন্য ভেতরে ভেতরে মরৰভূমির মতো তৃষিত হয়ে থাকে মানুষ। আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের ভাষা। বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি, পড়লেখা করি, গান গাই, ছবি আঁকি, সাহিত্য রচনা করি, হাসি–খেলি, আনন্দ–বেদনা প্রকাশ করি। অন্য ভাষায় আমাদের সব অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরৰল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ এই ভাষায় সাহিত্য রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবনের শুরৰতে অন্য ভাষায় সাহিত্য রচনা করে পরে আৰেপ করেছেন এবং মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা করে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছেন। মায়ের মুখের বুলি

থেকে শিশু তার নিজের ভাষা আয়ত্ত করা শুরব করে এবং এই ভাষাতেই তার স্বপ্নগুলোকে রূ প দেবার চেষ্টা করে। এই ভাষাতেই লেখাপড়া করে এবং জগৎ ও জীবনকে চিনতে শুরব করে। ভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক রৰার জন্য, দেশ–বিদেশের জ্ঞান–বিজ্ঞান ও সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত রাখার জন্য আমাদের অন্যান্য ভাষাও শিখতে হয়। কিন্তু কোনো বিষয় বোঝার জন্য মাতৃভাষার মতো সহায়ক আর কিছু নেই। অন্য ভাষা শেখার জন্যও মাতৃভাষার বুনিয়াদ শক্ত হওয়া জরবরি।

মন্তব্য : স্বদেশের ভাষাকে ভালোবাসতে হবে, এর বিকাশ ও সমৃদ্ধিকে অবাধ করতে হবে এবং বিকৃতিকে রোধ করতে হবে। সুপেয় জল যেমন আকর্ষণীয়, তেমনি স্বদেশের ভাষা সুমিষ্ট।

১৪

লাইব্রেরি জাতির সভ্যতা ও উন্নতির মানদণ্ড

মূলভাব : লাইব্রেরি হচ্ছে জ্ঞানের আধার। একটি জাতির রবচি, জ্ঞানের গভীরতা ও সভ্যতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় ঐ জাতির লাইব্রেরির মাধ্যমে।

সম্প্রসারিত ভাব : একটি জাতি বা দেশের সাহিত্য, জ্ঞান–বিজ্ঞান, খেলাধুলা–বিনোদন, সভ্যতা–সংস্কৃতির পরিচয়কে ধারণ করে সেই জাতির সযত্নে তৈরি লাইব্রেরি। কখনো কখনো মানুষের মুখ যেমন ব্যক্তির অন্তর্গত রূ প বা পরিস্থিতিকে নির্দেশ করে, তেমনি লাইব্রেরি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতিকে চিহ্নিত করে। লাইব্রেরি জাতির অতীত ও বর্তমানকে এক সুতায় বেঁধে রাখে এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা দেয়। জ্ঞানান্বেষী ও সত্যসন্ধানী মানুষ লাইব্রেরিতে এসে নিজেকে সমৃদ্ধ করে এবং জাতির ক্রমোন্নতিতে ভূমিকা রাখে। একটি লাইব্রেরিতে সংরৰিত সাহিত্যগ্রন্থ দেখে সংশিরষ্ট জাতির সাহিত্যরবচি উপলব্ধি করা যায়, বিজ্ঞানগ্রন্থ দেখে জাতির বিজ্ঞান–চিন্তা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুভব করা যায়। তাই গ্রন্থাগার হচ্ছে কালের সাৰী। জ্ঞান–বিজ্ঞানসংক্রান্ত যেকোনো প্রয়োজনে লাইব্রেরি পরম বন্ধু এবং অনন্ত উৎস। পৃথিবীতে যত বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে, সেগুলোর প্রতিটির পেছনে রয়েছে লাইব্রেরির গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই অনেক বড় বড় যুদ্ধের পরে দেখা গেছে বিজয়ী শক্তি পরাজিত জাতির লাইব্রেরিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। একটি বৃহৎ লাইব্রেরি জাতির সব ধরনের তথ্যই শুধু সংরৰণ করে না, দেশের সঠিক উন্নতিতেও প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। লাইব্রেরি মানুষের আনন্দেরও খোরাক জোগায় এবং মানুষের মনকে প্রশান্ত করে। বইপড়া মানুষের একটি সৃষ্টিশীল শখ। আর এই শখ পূরণের জন্য লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী।

মন্তব্য : যে জাতি যত উন্নত, সেই দেশের লাইব্রেরি তত সমৃদ্ধ।

১৫

পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না

মূলভাব : অন্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার মধ্যেই মানব জীবনের সার্থকতা।

সম্প্রসারিত ভাব : ফুল এই জগতের একটি অনিন্দ্যসুন্দর সৃষ্টি। তার সৌন্দর্যে মানুষ মুগ্ধ হয়। ফুলের সুবাসে মানুষের মন মেতে ওঠে। ফুল থেকে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে, ফুল থেকে তৈরি হয় ফল। সেই ফল মানুষ, পশু-পাখি খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত করে এবং দেহ ও মনের বিকাশের জন্য খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে। ফুল–ফল থেকে তৈরি হয় জীবন রৰাকারী অনেক ওষুধ। ফুলের প্রক্রিয়াজাতের মাধ্যমে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের সৌরভ। ফুল প্রিয়জনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উপহার। যেকোনো আনন্দ-উৎসবকে আরো সুন্দর, আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে ফুলের বিকল্প নেই। এভাবে অন্যের মধ্যে আনন্দ-সঞ্চার ও উপকারের মধ্যেই ফুলের পরিতুষ্টি। রূ প-ঘ্রাণ-লাবণ্য সবই অপরের জন্য বিলিয়ে দিয়ে ফুল ধন্য হয়। মানবসমাজেও এমন কিছু মানুষ আছেন, যারা অন্যের কল্যাণে নিজের সমস্ত অর্জন উৎসর্গ করেন। বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কার মানবসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে। সমাজ সেবকেরা নিজের জীবন তুচ্ছ করে সমাজকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যান। পরার্থপরতা একটি মহৎ গুণ। পরের উপকারে নিজেকে বিসর্জন দিলে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দ অনুভব করা যায়। নিজের দুঃখ–বেদনাও ভুলে থাকা যায়। স্বার্থচিন্তা মানুষকে সুখ দিতে পারে না।

মন্তব্য : পুষ্পকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করে মানবকল্যাণের ব্রত গ্রহণ করলে অনির্বচনীয় তৃপ্তি অনুভব করা সম্ভব।

১৬

বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে

মূলভাব : প্রকৃতির সবকিছুরই একটি স্বাভাবিক সৌন্দর্য আছে। সেই সৌন্দর্য যথোপযুক্ত পরিবেশেই স্বতঃস্ফূর্ত ও আকর্ষণীয়।

সম্প্রসারিত ভাব : সৌন্দর্য প্রকৃতির এক মহামূল্যবান দান। কোথায় সেই সৌন্দর্য সবচেয়ে মানানসই তা প্রকৃতিই নির্ধারণ করে দেয়। নির্দিষ্ট পরিবেশের ব্যত্যয় ঘটলে সৌন্দর্যের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য নিষপ্রভ হয়ে যায়। বণ্য প্রাণীরা বনেই সুন্দর, পাখি মুক্ত আকাশে। ফুল সুন্দর গাছে, মাছ স্বাভাবিক জলে। কিন্তু বন্য প্রাণীকে লোকালয়ে, পাখিকে খাঁচায়, ফুলকে ফুলদানিতে, মাছকে ডাঙায় রাখলে তাদের জীবনের গতি ব্যাহত হয়, সৌন্দর্যের হানি ঘটে, কখনো কখনো জীবননাশের আশঙ্কা তৈরি হয়। প্রত্যাশিত পরিমণ্ডল হারিয়ে এরা নিষপ্রাণ হয়ে ওঠে। শিশুরও যথার্থ স্থান মায়ের কোল। মায়ের কোলে শিশুকে যতটুকু মানায়, অন্য কোথাও তা সম্ভব নয়। নিজেদের শখ–আহ্লাদ পূরণের জন্য মানুষ কখনো কখনো কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করে বণ্য প্রাণী, পাখি, মাছ পোষার চেষ্টা করে, কিছুটা হয়তো সফলও হয়। কিন্তু এতে সেই সব প্রাণীর জীবনের ছন্দ নষ্ট হয়, বিকাশ ব্যাহত হয়। তাই কৃত্রিমতা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। শুধু প্রাণীর আবাস নয়, মানুষের জীবনেও কৃত্রিমতা কাম্য নয়।

মন্তব্য : যার যেখানে স্থান, তাকে সেখানেই থাকতে দেওয়া উচিত। প্রকৃত রূ পেই সবকিছু সুন্দর, কৃত্রিমতা স্বতঃস্ফূর্ততা ও নান্দনিকতার অন্তরায়।

১৭

সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই

মূলভাব : মানুষে মানুষে অনেক ধরনের বিভেদ-বৈষম্য থাকতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক বিবেচনায় সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে আমরা সবাই মানুষ।

সম্প্রসারিত ভাব : সব মানুষ একই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। সৃষ্টির মধ্যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর একই জল-হাওয়ায় আমরা বেড়ে উঠি। আমাদের সবার রক্তের রং লাল। তাই মানুষ একে অন্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ভৌগোলিকভাবে আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, অথবা আমরা যে যুগেরই মানুষ হই না কেন, আমাদের একটিই পরিচয়– আমরা মানুষ। কখনো কখনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা জাত-কুল-ধর্ম-বর্ণের পার্থক্য তৈরি করে মানুষকে দূরে ঠেলে দিই, এক দল আরেক দলকে ঘৃণা করি, পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হই। কিন্তু এগুলো আসলে সাময়িক। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে,

আমরা একে অন্যের পরম সুহৃদ। আমাদের উচিত সবাইকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা। প্রত্যেককে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া এবং তার অধিকার সংরৰণে একনিষ্ঠ থাকা। মানুষের মধ্যে নারী–পুরবষ, শিৰিত–অশিৰিত, ধনী–দরিদ্র, ব্রাহ্মণ–শূদ্র, আশরাফ–আতরাফ, হিন্দু–মুসলমান, বৌদ্ধ–খ্রিস্টান, কেন্দ্রবাসী–প্রান্তবাসী এমন ভাগাভাগি কখনোই কাম্য হতে পারে না। তাতে মানবতার অবমাননা করা হয়। তাই আধুনিককালে এক বিশ্ব, এক জাতি চেতনার বিকাশ ঘটছে দ্রবত। মানব জাতির একই একাত্ম–ধারণা প্রতিষ্ঠিত হলে যুগে যুগে, দেশে দেশে মারামারি, যুদ্ধ–বিগ্রহ কমে আসবে। মানুষ সংঘাত–বিদ্বেষমুক্ত শান্তিপূর্ণ এক বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। সর্বত্র মনুষ্যত্বের জয়গাথা ঘোষিত হবে।

মন্তব্য : সব ধর্ম–বর্ণ–গোত্রের মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, বিশুদ্ধভাবে ভালোবাসতে পারলেই বিশ্বে প্রার্থিত সুখ ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৮

চরিত্র মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ।

মূলভাব : চরিত্র মানবজীবনের মুকুটস্বরূ প। চরিত্রবান ব্যক্তিকে সবাই শ্রদ্ধা করে; চিরত্রহীনকে সকলে ঘৃণা করে।

সম্প্রসারিত ভাব : চারিত্রিক গুণাবলির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের মহিমা প্রকাশ পায়। চরিত্রবান ব্যক্তি কতগুলো গুণের অধিকারী হন। সততা, বিনয়, উদারতা, নম্রতা, ভদ্রতা, রবচিশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদীতা, লোভহীনতা, পরোপকারীতা ইত্যাদি গুণ চরিত্রবান ব্যক্তিকে মহত্ত্ব দান করে। এসব গুণ যদি মানুষের মধ্যে না থাকে, তাহলে সে পশুরও অধম বলে বিবেচিত হয়। চরিত্রহীন ব্যক্তির মানুষ হিসেবে কোনো মূল্য নেই। চরিত্রবান ব্যক্তি তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের গুণে সমাজে সমাদৃত হন। অন্যদিকে চরিত্রহীন ব্যক্তিকে কেউ ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে না, বরং ঘৃণা করে। চরিত্রবান ব্যক্তি জাগতিক মায়া–মোহ–লোভ–লালসার বন্ধনকে ছিন্ন করে লাভ করেন অপরিসীম শ্রদ্ধা ও অফুরন্ত সম্মান।

মন্তব্য : অর্থ–বিত্ত–গাড়ি–বাড়ি প্রভৃতির চেয়ে চরিত্র অনেক বড় সম্পদ। আর এ মর্যাদা অর্থ–মূল্যে নয়, মানবিকতা ও নৈতিক পবিত্রতার মানদণ্ডে বিচার করতে হয়। সকলেরই উচিত চরিত্রবান হওয়ার সাধনা করা।

১৯

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি

মূলভাব : সৌভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে কোনো মানুষের জন্ম হয় না। কর্মের মাধ্যমে মানুষ তার ভাগ্য গড়ে তোলে। পরিশ্রমই সৌভাগ্য বয়ে আনে।

সম্প্রসারিত ভাব : যিনি জন্ম দান করেন তিনি প্রসূতি। মা যেমন সন্তানের প্রসূতি, তেমনি পরিশ্রম হলো সৌভাগ্যের প্রসূতি বা উৎস। মানুষকে তার কর্মফল ভোগ করতে হয়। ভালো কাজের ফল ভালো, মন্দ কাজের ফল মন্দ। কোনো কাজই সহজ নয়। আবার কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কঠিন কাজও সহজ হয়। জীবনে উন্নতি করতে হলে পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। পরিশ্রম ছাড়া কেউ কখনো তার ভাগ্যকে গড়ে তুলতে পারেনি। জীবনে অর্থ, বিদ্যা, যশ, প্রতিপত্তি লাভ করতে হলে অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে। ছাত্রজীবনে কঠোর পরিশ্রম করে শিৰালাভ না করলে ভবিষ্যত জীবনে সাফল্য লাভ সম্ভব নয়। পরিশ্রম ছাড়া জাতীয় উন্নতিও লাভ করা যায় না।

মন্তব্য : শ্রমই হলো উন্নতির চাবিকাঠি। যে জাতি পৃথিবীতে যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি তত উন্নত। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই জাতির অগ্রগতি অর্জন করা যায়।

২০

শিৰাই জাতির মেরবদণ্ড

মূলভাব : শিৰাই আলো, নিৰরতা অন্ধকার। শিৰা মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়, মানুষের অন্তরের প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলে।

সম্প্রসারিত ভাব : জীবন ছাড়া শরীর মূল্যহীন, শিৰা ছাড়া জীবনের কোনো মূল্য নেই। শিৰাহীন মানুষ আর অন্ধের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যে জাতি শিৰা থেকে বঞ্চিত সে জাতি পঙ্গুত্ব নিয়ে বেঁচে থাকে। তাই নিরৰর জনগোষ্ঠী জাতির জন্য বোঝাস্বরূ প।মেরবদণ্ডহীন মানুষ যেমন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিৰা ছাড়া কোনো জাতি সফল হয় না। যে দেশের লোক যত বেশি শিৰিত, সে দেশ তত বেশি উন্নত। জাতীয় জীবনে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে শিৰার ওপর। মানুষের পূর্ণ বিকাশের জন্যই শিৰা প্রয়োজন। শিৰা শুধু ব্যক্তিজীবনে উন্নতি বয়ে আনে না সমাজ জাতি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সব রকম উন্নতিও সাধন করে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ আজ তাই নিরৰরতার বিরবদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

মন্তব্য : উন্নতির একমাত্র চাবিকাঠি শিৰা। শিৰা ব্যক্তিজীবন ও জাতির ভবিষ্যৎ কল্যাণ বয়ে আনে। জাতিকে প্রকৃত শিৰায় শিৰিত করে গড়ে তোলা একান্ত জরবরি।

২১

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

মূলভাব : জীবন কর্মময়। কর্মশক্তির মূলে রয়েছে উৎসাহ–উদ্দীপনা আর প্রবল আগ্রহ। আগ্রহের সঙ্গে নিষ্ঠা যুক্ত থাকলে অসাধ্যকেও সাধ্য করা যায়।

সম্প্রসারিত ভাব : মানুষকে সব বাধা অতিক্রম করতে সাহায্য করে তার ইচ্ছাশক্তি। প্রতিদিনই আমাদের কোনো না কোনো কাজ করতে হয়। পৃথিবীতে কোনো কাজই বিনা বাধায় করা যায় না। সব কাজেই কিছু না কিছু সুবিধা–অসুবিধা ও বাধা–বিপত্তি থাকে। সেই অসুবিধা ও বাধা–বিপত্তি অতিক্রম করতে পারলেই সাফল্য আসে। এজন্য প্রয়োজন প্রবল ইচ্ছা। ইচ্ছা থাকলে কোনো কাজ আটকে থাকে না। ইচ্ছাই সকল কর্মের প্রেরণা। ইচ্ছাই মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। দৃঢ় ইচ্ছার কাছে সকল বাধা হার মানে। প্রবল ইচ্ছা নিয়ে কোনো কাজ করলে অতি কঠিন কাজও শেষ করা যায়। পৃথিবীর মহান ব্যক্তিরা এভাবেই সব ধরনের বিপত্তি অতিক্রম করে লৰ্যে পৌঁছেছেন। সম্রাট নেপোলিয়ান তাঁর সেনাবাহিনীসহ আল্পস পর্বতের কাছে গিয়ে অসীম উৎসাহে বলে ওঠেন : 'আমার বিজয় অভিযানের মুখে আল্পস পর্বত থাকবে না।' আত্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির বলে তিনি আল্পস পার হতে পেরেছিলেন।

মন্তব্য : মানুষের সকল কাজের মূল হলো ইচ্ছাশক্তি। ইচ্ছাই মানুষকে সাফল্যের দ্বারে পৌঁছে দেয়।

২২

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী পরে,

সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।

মূলভাব : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তাকে বেঁচে থাকতে হয়।

সম্প্রসারিত ভাব : সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের জীবন অর্থহীন। কারণ, সমাজে প্রতিটি মানুষ একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি কেবল নিজের কথা ভাবে, সমাজের কথা ভাবে না, সে স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক। সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষ কখনোই সুখী হয় না। যারা নিজের কথা না ভেবে সমাজের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য নিজেদের জীবন বিলিয়ে দেয় তারাই প্রকৃত মানুষ। অন্যের সুখের জন্য যারা ত্যাগ স্বীকার করে, তাদের মতো সুখী আর কেউ নেই। সমাজে এ রকম মানুষেরাই চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসাই প্রকৃত মানবধর্ম। আজকের এই সভ্যতা গড়ে ওঠার পেছনে কাজ করেছে মানুষের শুভবুদ্ধি ও অন্যের কল্যাণ করার ইচ্ছা।

মন্তব্য : ত্যাগের মাঝেই জীবনের সার্থকতা নিহিত, ভোগের মাঝে নয়।

২৩

কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহিতে?

মূলভাব : পৃথিবীতে যেকোনো কাজে সাফল্য লাভ করার জন্য প্রয়োজন ঐকান্তিক সাধনা ও নিষ্ঠা; প্রয়োজন সকল প্রতিকূলতাকে জয় করার মনোবল ও সহ্যশক্তি।

সম্প্রসারিত ভাব : হৃদয়গ্রাহী সৌন্দর্যের কারণে ফুল সবার কাছে প্রিয়। কিন্তু তার গায়ে রয়েছে কাঁটা। তাকে পেতে হলে অতিক্রম করা দরকার কাঁটার বাধা। ফুল সংগ্রহকারীকে সহ্য করতে হবে কাঁটার আঘাত। এ আঘাতে হাত ক্ষতবিক্ষত হওয়াও বিচিত্র নয়। যিনি এ আঘাতের কষ্টটুকু বরণ করতে প্রস্তুত, তিনি অবশ্যই কমল পেতে পারেন। পৃথিবীতে মানুষের চলার পথ কখনোই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি অর্জনের পূর্বশর্ত এই কণ্টকাকীর্ণ দুঃখময় পথে সমস্ত প্রতিকূলতাকে হাসিমুখে বরণ করে অগ্রসর হওয়া। দুঃখকে বরণ করতে না শিখলে সুখ অর্জন করা সম্ভব নয়। কাঁটার আঘাতের ভয়ে কেউ পদ্মফুল সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকলে, তার পক্ষে কখনোই পদ্মফুল সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ক্লান্তির ভয়ে পথিক ভীত হয়ে পড়লে তার পক্ষে কখনও গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। তাই জীবনে চলার পথের সকল প্রতিকূলতাকে তুচ্ছজ্ঞান করে দৃপ্ত সংকল্পে মানুষকে অগ্রসর হতে হয় ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্যে।

মন্তব্য : জীবনে সুখলাভের পূর্বশর্ত হচ্ছে দুঃখকে হাসিমুখে বরণ করে নিতে শেখা। শ্রমকে ভয় পেলে জীবনে সাফল্য আসে না। জীবনে কোনো মহৎ প্রাপ্তিই ত্যাগ-তিতিক্ষা ছাড়া অর্জিত হয় না।

৩. অনুধাবন শক্তি ও অনুচ্ছেদ

❑ অনুধাবন শক্তি

লিখিত যে কোনো বিষয়ে কোনো না কোনো মানুষ পাঠ করে থাকে কিন্তু যে অংশটুকু পড়ে তার মূলভাব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে তাকে বলা হয় তার অনুধাবন দক্ষতা। একটি পাঠে কিছু শব্দ থাকে, কিছু নতুন বিষয় থাকতে পারে যার অর্থ বা ধারণা জানা না থাকলে পাঠটির পূর্ণ ধারণা লাভ সহজ হয় না। তাই একটি পাঠ সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হলে পাঠ সংশিক্ষষ্ট কিছু বিষয়ও জানতে এবং বুঝতে হয়। আবার তা কেবল মুখস্ত করলে সেটি বেশিদিন মনে নাও থাকতে পারে। সেই জানা জ্ঞান অন্য কোনো পাঠের সাথে বা জ্ঞানের সাথে মেলাতে পারার ক্ষমতাও থাকতে হয়। এ ভাবেই অনুধাবন দক্ষতা পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়।

[পাঠ্য বই থেকে]

১. অনুধাবন শক্তি পরীক্ষা :

স্পন্দন, প্রতীতি, প্রান্ত, হিমেল, বর্ণ, প্রাপ্তি শীতের ছুটিতে জগৎপট্টিতে বেড়াতে গিয়েছে। ওরা সবাই এলাকাটি ঘুরে ঘুরে দেখল। ওখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি বাজার আছে। এলাকার অধিকাংশ মানুষই শিক্ষিত। কৃষিজীবী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ীসহ নানা পেশার মানুষ সেখানে বসবাস করে। বেশকিছু লোক জীবিকার তাগিদে মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপসহ নানা দেশে চাকরি নিয়ে গেছে। এলাকার জনগণ মোটামুটি সচ্ছল। বৈদেশিক অর্থ লেন-দেনের জন্য ওখানে বেশকিছু ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোনো কোনো বাড়িতে ফুলের বাগান রয়েছে। জগৎপট্টি বাংলাদেশের একটি আদর্শ গ্রামীণ এলাকা।

কর্ম-অনুশীলন :

ক. 'প্রতীতি' শব্দের অর্থ কী?
খ. কৃষিজীবী কারা?
গ. নানান পেশার মানুষ বলতে কী বুঝায়?
ঘ. জীবিকা বলতে কী বুঝ?
ঙ. আদর্শ গ্রামের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর :

ক. 'প্রতীতি' শব্দের অর্থ জ্ঞান।
খ. কৃষি কাজ করার মাধ্যমে যারা জীবিকা অর্জন করে তারাই কৃষিজীবী।

গ. সব মানুষের জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি এক নয়। একেক জন একেক ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকেন। কেউ চাকরি করেন, কেউ কৃষিকাজ করেন, কেউ মাছ ধরেন কেউ শিৰকতা করেন, কেউ বা ব্যবসা করেন। নানা পেশার মানুষ বলতে এই বৈচিত্রপূর্ণ কাজে নিয়োজিত মানুষদেরই বোঝানো যায়।

ঘ. জীবন ধারণের জন্য আমরা যে কাজের সাথে জড়িত থাকি তা-ই আমাদের জীবিকা।

মানুষের জীবন ধারনের জন্য অর্থ উপার্জন করতে হয়। এজন্য মানুষ নানা ধরনের কাজ করে। অর্থাৎ বিভিন্ন পেশায় কর্মরত থাকে। এভাবে যে কাজ বা পেশায় নিয়োজিত থেকে আমরা পারিশ্রমিক অর্জন করি সেই কাজ বা পেশাই জীবিকা হিসেবে পরিচিত।

ঙ. একটি আদর্শ গ্রাম বলতে আমরা বুঝি সেই গ্রামকে যেখানে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থার সুন্দর সমন্বয় থাকে।

একটি আদর্শ গ্রামে প্রয়োজনীয় শিৰা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি দরকারি ব্যবসা, ধর্মীয় ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সঠিক পরিমাণে থাকে। জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ নিশ্চিত হয়। মানুষের মাঝে শান্তি–শৃঙ্খলা বিদ্যমান থাকে।

[অতিরিক্ত অংশ]

১. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং অনুধাবন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

নকশিকাঁথা আমাদের একটি গ্রামীণ লোকশিল্প। এ শিল্প আজ লুপ্তপ্রায় হলেও এর কিছু নমুনা পাওয়া যায়। আপন পরিবেশ থেকেই মেয়েরা তাঁদের মনের মতো করে কাঁথা সেলাইয়ের অনুপ্রেরণা পেতেন। কাঁথার প্রতিটি সুচের ফোঁড়ের লুকিয়ে আছে এক একটি পরিবারের কাহিনি, তাদের পরিবেশ, তাদের জীবনগাথা। আমাদের দেশের কুমোরপাড়ার শিল্পীরা বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্র ছাড়াও পোড়ামাটি দিয়ে নানা প্রকার শৌখিন দ্রব্য তৈরি করে থাকে। নানা প্রকার পুতুল, মূর্তি ও আধুনিক রবচির ফুলদানি, ছাইদানি, চায়ের সেট ইত্যাদি তারা গড়ে থাকে। খুলনার মাদুর ও সিলেটের শীতলপাটি সকলের কাছে পরিচিত।

i. 'গ্রামীণ' শব্দের বিপরীত শব্দ কী? ১
ii. 'আধুনিক' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ কী? ১
iii. 'অনুপ্রেরণা' শব্দের দুটি সমার্থক শব্দ লেখ। ১
iv. লোকশিল্প কী? ১
v. নকশিকাঁথার নকশাগুলো সংগ্রহ করা হতো কোথা থেকে? ১

উত্তর :

i. 'গ্রামীণ' শব্দের বিপরীত শব্দ 'শহুরে'।
ii. 'আধুনিক' শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ 'আধুনিকা'।
iii. 'অনুপ্রেরণা' শব্দের দুটি সমার্থক শব্দ হচ্ছে উৎসাহ ও উদ্দীপনা।
iv. দেশি জিনিস দিয়ে দেশের মানুষের হাতে তৈরি শিল্পসম্মত দ্রব্যকে লোকশিল্প বলে। যেমন– মাটির পুতুল আমাদের গ্রামীণ লোকশিল্প।
v. নকশিকাঁথার নকশাগুলো সংগ্রহ করা হতো গ্রামীণ আপন পরিবেশ থেকে। নকশিকাঁথার শিল্পীদের জীবনবাস্তবতার প্রতিফলন ঘটে নকশাগুলোতে।

২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং অনুধাবন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দুঃখ চোখে জল হয়ে দেখা দেয়। চোখের পাতায় দুঃখ টলমল করে এক ফোঁটা জল হয়ে। শহিদ মিনারের দিকে তাকালে মনে হয় মুক্তোর মতো; কিন্তু তা দুঃখের মুক্তো। শহিদ মিনারও সুন্দর, কিন্তু অনেক বেদনার,। অনেক দীর্ঘশ্বাসের। কার চোখে টলমল করছে ওই জলের ফোঁটা, ওই দুঃখে নীরবে কাঁদছে সবুজ বাংলাদেশ, তার চোখে টলমল করছে কান্না। শহিদ মিনার বাংলাদেশের চোখের জল।

ক. 'নীরব' শব্দের বিপরীত শব্দ কী? ১
খ. শহিদ মিনার বেদনার কেন? ১
গ. 'দুঃখ'–এর দু'টি প্রতিশব্দ লেখ। ১
ঘ. শহিদ মিনার ও জাতীয় স্মৃতিসৌধের মধ্যে চেতনাগত সাদৃশ্য উলেরখ করো। ২

উত্তর :

ক. 'নীরব' শব্দের বিপরীত শব্দ 'সরব'।

খ. শহিদ মিনারের সাথে আমাদের ভাই হারানোর বেদনার স্মৃতি জড়িত। তাই শহিদ মিনার বেদনার।

১৯৫২ সালে ভাষা–আন্দোলনে পাকিস্তান সরকারের পুলিশের গুলিতে নৃশংস হত্যার শিকার হন– সালাম, রফিক, জব্বার, বরকতসহ নাম না জানা আরও অনেকে। তাঁদের সেই মহান আত্মত্যাগের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয় শহিদ মিনার। ভাই হারানোর স্মৃতি মনে করিয়ে দেয় বলে শহিদ মিনার বেদনার।

গ. 'দুঃখ'-এর দুটি প্রতিশব্দ হলো– কষ্ট ও বেদনা।

ঘ. শহিদ মিনার ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ উভয়ই আমাদের জাতীয় প্রতীক।

শহিদ মিনার আমাদের মনে করিয়ে দেয় ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন ও সেই আন্দোলনের শহিদদের কথা। আর স্মৃতিসৌধ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মারক। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি মাতৃভাষার অধিকার। আর মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন স্বদেশভূমি। তাই উভয় স্থাপত্যই আমাদের মনে দেশপ্রেমের চেতনা জাগিয়ে তোলে।

৩. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং অনুধাবন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সৌভাগ্য আকাশ থেকে পড়ে না। জীবনে সৌভাগ্য অর্জনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম ও নিরন্তর সাধনার দরকার হয়। সব মানুষের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা আছে। পরিশ্রমের দ্বারা সেই সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে হয়। যে মানুষ কর্মকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে, জীবন সংগ্রামে তারই জয় হয়েছে। কর্মের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি জীবনে সফল সৈনিক হতে পারে। কর্মহীন ব্যক্তি সমাজের বোঝাস্বরূ প। অন্যদিকে, শ্রমশীলতাই মানব জীবনের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। আমাদের জীবনে উন্নতি করতে হলে, জীবনে সুখী হতে হলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই।

i. 'সৌভাগ্য' শব্দের বিপরীত শব্দ কী? ১
ii. সৌভাগ্য অর্জনের জন্য কী করতে হয়? ১
iii. কে সমাজের বোঝা? ১
iv. জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে হলে কিসের প্রয়োজন? ২

উত্তর :

i. 'সৌভাগ্য' শব্দের বিপরীত শব্দ হচ্ছে 'দুর্ভাগ্য'।
ii. সৌভাগ্য অর্জনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম ও নিরন্তর সাধনা করতে হয়।
iii. কর্মহীন ব্যক্তি সমাজের বোঝা।

iv. জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে হলে কর্মকাকে জীবনের মূল লৰ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। পরিশ্রমই উন্নতির মূল চাবিকাঠি। কর্মের প্রতি একনিষ্ঠ ব্যক্তিগণই জীবন সংগ্রামে সফল হয়েছেন।

৪. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং অনুধাবন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সুন্দরকে জানার যে জ্ঞান তার নাম 'নন্দনতত্ত্ব'। নন্দনতত্ত্ব মানে সুন্দরকে বিশেৱষণ করা, সুন্দরকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করা। সব সুন্দরের সৃষ্টির মধ্যেই একটা রূ প আছে, তার নাম স্বাধীনতা– অপর নাম যা খুশি তাই করা। যে কাজ সকলকে আনন্দ দেয়, খুশি করে তাই সুন্দর। স্বার্থপর বা অসংগত আমির খুশি নয়, অনেক মনে খুশির বিস্তার করা আমি। অন্ধকার ঘর আলোকিত করার জন্যে নিয়ম মেনে প্রদীপ জ্বালতে হয়, ঘরে অসংগত আগুন লাগিয়ে ঘর আলোকিত করা নয়।

i. 'আগুন' শব্দের দুটি সমার্থক শব্দ লেখ। ১
ii. সুন্দর–এর বিপরীত শব্দ লেখ। ১
iii. সুন্দরকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার নাম কী? ১
iv. অন্ধকার ঘরে কীভাবে আগুন জ্বালাতে হবে? ১
iv. অনুচ্ছেদে 'স্বাধীনতা' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? ১

উত্তর :

i. 'আগুন' শব্দের দুটি সমার্থক শব্দ হলো অগ্নি ও হুতাশন।
ii. সুন্দর–এর বিপরীত শব্দ হলো কুৎসিত।
iii. সুন্দরকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার নাম নন্দনতত্ত্ব।
iv. অন্ধকার ঘরে নিয়ম মেনে আগুন জ্বালাতে হবে। সারা ঘরে যথেচ্ছভাবে আগুন না জ্বালিয়ে প্রদীপ জ্বালাতে হবে।
iv. অনুচ্ছেদে স্বাধীনতা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে মনের আনন্দ প্রকাশ করা অর্থে।
সুন্দর সৃষ্টির জন্য মানুষ নানা শিল্পমাধ্যম বেছে নেয়। সে মাধ্যমগুলোতে মনের স্বাধীনতা বা আনন্দের প্রকাশ ঘটে।

৫. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং অনুধাবন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

দিনদিন চাষের জমি-জমা কমছে। বন-টন উজাড় হয়ে যাচ্ছে। মাঠে-মাঠে ফসল নেই। বনে-বনে জীবজন্তু নেই। বছর-বছর লোকজন বাড়ছে, বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, কল-কারখানা হচ্ছে। খাল-বিল, পুকুর-টুকুর দখল ও ভরাট হয়ে যাচ্ছে। আমাদের পরিবেশ ও ভবিষ্যতের জন্যে এটি মারাত্মক হুমকিস্বরূ প।

i. 'দিনদিন'–দ্বিরুক্ত শব্দটির প্রতিশব্দ কী? ১
ii. 'পুকুর-টুকুর' দ্বিরুক্ত শব্দটি কীভাবে গঠিত হয়েছে? ১
iii. এ অনুচ্ছেদে কতটি বিভিন্ন রকমের দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে? ১
iv. অনুচ্ছেদে যে পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে তা আমাদের পরিবেশ ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য মারাত্মক হুমকি কেন? ২

উত্তর :

i. 'দিনদিন' দ্বিরুক্ত শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে প্রতিদিন।
ii. 'পুকুর-টুকুর' দ্বিরুক্ত শব্দ-জোড়ায় দ্বিতীয় শব্দটির আংশিক পরিবর্তনের মাধ্যমে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠিত হয়েছে।
iii. এ অনুচ্ছেদে ১১টি বিভিন্ন রকমের দ্বিরুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।
iv. অনুচ্ছেদে যে পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে তা আমাদের পরিবেশ ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অশনিসংকেত।
আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিনিয়তই মানুষের হাতে ধ্বংস হচ্ছে। গাছপালা, নদীনালা, সবুজ ফসলের মাঠের স্থানে হচ্ছে বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, কল-কারখানা। ফলে পরিবেশের দূষণ বাড়ছে। সেই সাথে পরিবেশের ভারসাম্যও নষ্ট হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে।

৬. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং অনুধাবন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

এক দল লোক মনে করতেন ওই সংস্কৃত ভাষাই বাংলার জননী। বাংলা সংস্কৃতের মেয়ে। তবে দুষ্টু মেয়ে, যে মায়ের কথা মতো চলেনি। না চলে চলে অন্যরকম হয়ে গেছে। তবে উনিশ শতকেই আরেক দল লোক ছিলেন, যাঁরা মনে করতেন বাংলার সাথে সংস্কৃতের সম্পর্ক বেশ দূরের। তাঁদের মতে, বাংলা ঠিক সংস্কৃতের কন্যা নয়। অর্থাৎ সরাসরি সংস্কৃত ভাষা থেকে উৎপত্তি ঘটেনি বাংলার। ঘটেছে অন্য কোনো ভাষা থেকে। সংস্কৃত ছিল সমাজের উঁচুশ্রেণির মানুষের লেখার ভাষা।

ক. 'জননী' শব্দের বিপরীত শব্দ কী? ১
খ. বাংলা ভাষাকে দুষ্টু মেয়ে বলা হয়েছে কেন? ১
গ. 'মেয়ে'– শব্দের দুটি প্রতিশব্দ লেখ। ১
ঘ. 'বাংলা সংস্কৃতের মেয়ে'– এর পৰে বিপৰে যুক্তি দেখাও। ২

উত্তর :

ক. 'জননী' শব্দের বিপরীত হলো– 'জনক'।

খ. সংস্কৃত ভাষা থেকে বিচ্যুতি লাভ করেছে বলে বাংলাকে দুষ্টু মেয়ে বলা হয়েছে।
এক দল লোকের ধারণা ছিল বাংলাভাষার জন্ম হয়েছে সংস্কৃত থেকে। সে হিসেবে সংস্কৃত হলো বাংলা ভাষার জননী। তাদের মতে সংস্কৃত থেকে খানিকটা বিচ্যুত হয়ে পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে বাংলার আজকের রূ প তৈরি হয়েছে। সংস্কৃত ভাষা অর্থাৎ মায়ের কথামতো চলে নি বলেই বাংলাকে দুষ্টু মেয়ে বলা হয়েছে।

গ. 'মেয়ে' শব্দের দুটি প্রতিশব্দ হলো– কন্যা ও জায়া।

ঘ. আমরা জানি, মানুষের মুখের কথায় বদল ঘটে ভাষার ধ্বনির। শব্দ ও শব্দের অর্থেরও বদল ঘটে। এভাবে এক ভাষা থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে রূ প লাভ করে অন্য একটি ভাষা। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সংস্কৃতি থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হওয়াটা সম্ভব নয়। কেননা সংস্কৃত ছিল তৎকালীন সমাজের কেবলমাত্র লেখার ভাষা। কথা বলায় এ ভাষার ব্যবহার ছিল না।

৭. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং অনুধাবন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বাংলা সনের প্রথম মাসের নাম বৈশাখ। পয়লা বৈশাখ বাঙালির নববর্ষ। নববর্ষ সকল দেশের, সকল জাতিরই আনন্দ উৎসবের দিন। শুধু আনন্দ উচ্ছ্বাসই না, সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনারও দিন। আমরাও সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়েই মহাধুমধামের সঙ্গো আমাদের নববর্ষ উদ্‌যাপন করি। একে অন্যকে বলি শুভ নববর্ষ।

i. 'আনন্দ' শব্দের বিপরীত শব্দ কী? ১
ii. 'উচ্ছ্বাস' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করো। ১
iii. বাংলা সনের প্রবর্তক কে? ১
iv. বাংলা নববর্ষের মতো সার্বজনীন আরো একটি উৎসবের সংৰিপ্ত পরিচয় দাও। ২

উত্তর :

i. ‘আনন্দ’ শব্দের বিপরীত শব্দ হলো ‘কষ্ট’।
ii. ‘উচ্ছ্বাস’ শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ হলো– উৎ + শ্বাস।
iii. বাংলা নববর্ষের ইতিহাস এখনো সুস্পষ্টভাবে জানা সম্ভব হয় নি। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও পন্ডিতের মতে মুঘল সম্রাট বাদশাহ আকবর বাংলা সন চালু করেন।
iv. বাংলা নববর্ষের মতো আরও একটি সার্বজনীন উৎসব হলো বিজয় উৎসব।
আমাদের মহান বিজয় দিবস অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বর আমরা এই উৎসব করে থাকি। এদিন সারা দেশ লাল সবুজে সেজে ওঠে। সর্বস্তরের বাঙালি এই উৎসবে আনন্দের সাথে অংশ নেয়।

৮. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং অনুধাবন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আমাদের দেশের উন্নতির প্রধান অন্তরায় আমাদের জনসংখ্যা সমস্যা। এই জনসংখ্যা সমস্যাকে জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে দেশের উন্নতি সম্ভব। তাদেরকে প্রয়োজনীয় কর্মৰেত্রে কাজে লাগিয়ে দিতে হবে। কারিগরি শিৰাকে গুরবত্ব দিতে হবে। জনগণ কায়িক পরিশ্রমের মর্যাদা পেলে তারা কায়িক পরিশ্রমের দিকে আগ্রহী হবে। পরিশ্রমী জনগণ দ্বারা দেশের ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব।

i. ‘উন্নতি’ শব্দের বিপরীত শব্দ কী? ১
ii. কারিগরি শিৰা বলতে কী বোঝ? ২
iii. ‘জাতি’–এর দুটি প্রতিশব্দ লেখো। ১
iv. ‘জনসংখ্যা সমস্যা’ আমাদের দেশের উন্নতির প্রধান অন্তরায়– বিশেৱষণ করো। ২

উত্তর :

i. ‘উন্নতি’ শব্দের বিপরীত শব্দ হলো অবনতি।
ii. কারিগরি শিৰা বলতে বোঝায় হাতে–কলমে লাভ করা বিশেষ শিৰা।
একজন ব্যক্তি তার আত্মপ্রতিষ্ঠার লৰ্যে যখন বিশেষ কোনো কর্মে প্রশিৰিত হন তখন সেই শিৰাকে কারিগরি শিৰা বলে। এই শিৰা হাতে-কলমে গ্রহণ করা হয় এবং শিৰা শেষেই জীবিকা অর্জনের যোগ্যতা অর্জিত হয়।
iii. ‘জাতি’ শব্দের দুটি প্রতিশব্দ হলো– বর্ণ এবং শ্রেণী।
iv. জনসংখ্যা সমস্যা থেকে তৈরি হচ্ছে আরও নানা ধরনের সমস্যা যা জাতির উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।
জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীতে অন্যতম। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের জন্য দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ও প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ মোটেই যথেষ্ট নয়। ফলে দেশে বাড়ছে বেকার সমস্যা, অপরাধ প্রবণতা ইত্যাদি। আর এগুলো আমাদের উন্নতির ৰেত্রে বাধা সৃষ্টি করেছে।

৯. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং অনুধাবন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

আজ থেকে প্রায় দুইশ বৎসর আগে পৃথিবীতে শিল্পবিপৱব হয়েছিল। যারা সেই শিল্পবিপৱবে অংশ নিয়েছিল তারা পৃথিবীটাকে শাসন করেছে। আমরা শিল্পবিপৱবে অংশ নিতে পারিনি বলে বাইরের দেশ আমাদের শাসন–শোষণ করেছে। আমরা আবার সেটা হতে দিতে পারি না। এই মুহূর্তে শিল্পবিপৱবের মতো গুরবত্বপূর্ণ একটা বিপৱব হচ্ছে–তথ্য প্রযুক্তির বিপৱব। এ বিপৱবে আমাদের অংশ নিতেই হবে। তাই দায়িত্বটা পালন করতে হবে নতুন প্রজন্মকে, যারা নতুন বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে জ্ঞানে–বিজ্ঞানে এবং প্রযুক্তিতে। তারা ঠিকভাবে লেখাপড়া করবে, অন্য সব বিষয়ের সাথে সাথে গণিত ও ইংরেজিতে সমান দৰ হয়ে উঠবে, কম্পিউটারের সাথে পরিচিত হবে। যখন কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ পাবে তখন সেটাকে বিনোদনের একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার না করে শেখার একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবে। নিজেদের সৃজনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। তারা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ হিসেবে গড়ে উঠে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে তুলতে সাহায্য করবে।

i. ‘প্রজন্ম’ শব্দটি কী সাধিত শব্দ? ১
ii. পৃথিবী’ শব্দটির দুটি সমার্থক শব্দ লেখো। ১
iii. সৃজনশীল মানুষ কারা? ১
iv. তথ্য–প্রযুক্তির বিপৱব ঘটাতে হবে কেন? ১
v. কম্পিউটারকে শেখার একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে কেন? ১

উত্তর :

i. ‘প্রজন্ম’ শব্দটি উপসর্গ সাধিত শব্দ।
ii. ‘পৃথিবী’ শব্দটির দু’টি সমার্থক শব্দ হলো– ধরণী ও বসুন্ধরা।
iii. যারা নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে পারে তারাই সৃজনশীল মানুষ।
iv. বর্তমান পৃথিবীর সবকিছুই তথ্য–প্রযুক্তির অধীন। এর যথাযথ ব্যবহার ছাড়া জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই তথ্য–প্রযুক্তির বিপৱব ঘটাতে হবে।
v. তথ্য–প্রযুক্তি ব্যবহারের মূল হাতিয়ার হলো কম্পিউটার। তাই কম্পিউটার ব্যবহারে সবাইকে দৰ হতে হবে। কেবল বিনোদনের মাধ্যমে হিসেবে নয়, শেখার মাধ্যম হিসেবে এটিকে গ্রহণ করতে হবে।

১০. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং অনুধাবন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ছাত্রদের অলসতা ত্যাগ করে পরিশ্রমী হতে হবে। দেখা যায় অনেক মেধাবী ছাত্রও অলসতার কারণে পরীৰায় ভালো ফলাফল করতে ব্যর্থ হয়। আবার অনেক কম মেধার ছাত্র শুধু অধ্যবসায় ও পরিশ্রম দ্বারা আশাতীত সাফল্য অর্জন করে চমক সৃষ্টি করে। তাই ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়ের গুরবত্ব অপরিসীম।

i. ‘অলস’ শব্দের অর্থ কী? ১
ii. ‘ব্যর্থ’ শব্দের বিপরীত শব্দ লেখো। ১
iii. ‘পরীৰা’ শব্দটির সন্ধি–বিচ্ছেদ করো। ১
iv. “অধ্যবসায় সাফল্যের পূর্বশর্ত”– ব্যাখ্যা করো। ২

উত্তর :

i. ‘অলস’ শব্দের অর্থ ‘অকর্মণ্য’।
ii. ‘ব্যর্থ’ শব্দের বিপরীত শব্দ হলো ‘সফল’।
iii. ‘পরীৰা’ শব্দটির সন্ধি–বিচ্ছেদ হলো : পরি+ঈৰা।
iv. অধ্যবসায় ব্যতীত কোনো কিছুতেই কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করা যায় না।
মানুষের সংগ্রামী জীবনের জন্য অধ্যবসায় একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ। এর মাধ্যমেই মানুষ সকল কিছুকে সম্ভব করে তুলতে পারে। ছাত্রজীবনেও এই গুণটির গুরবত্ব অপরিসীম। অনেক কম মেধার ছাত্ররাও অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের মাধ্যমে চমৎকার সাফল্য অর্জন করতে পারে। সকল প্রতিকূলতার বিরবদ্ধে লড়াই করার মৌলিক প্রেরণা হলো অধ্যাবসায়।

১১ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং অনুধাবন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

লোকশিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব আমাদের সকলের। বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর, শহরতলি এবং গ্রামের হাজার হাজার নারী-পুরুষ আছে, যারা কাজ করতে চায় অথচ কাজের অভাবে দিন দিন দারিদ্র্যের শিকার হচ্ছে। সুপরিকল্পিত উপায়ে এবং সুরুচিপূর্ণ লোকশিল্প প্রস্তুতির দিকে মনোযোগ দিলে তাদের সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে।

i. 'সম্প্রসারণ' শব্দের অর্থ কী? ১
ii. লোকশিল্প কাকে বলে। ১
iii. 'দিন দিন' কোন ধরনের দ্বিরুক্ত শব্দ? ১
iv. কীভাবে লোকশিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। ২

উত্তর :

i. 'সম্প্রসারণ' শব্দের অর্থ বৃদ্ধি বা বিস্তার।
ii. দেশি জিনিস দিয়ে দেশের মানুষের হাতে তৈরি শিল্পসম্মত দ্রব্যকেই লোকশিল্প বলে।
iii. 'দিন দিন' হলো বিশেষ্য শব্দযুগলের বিশেষরূপে ব্যবহারে গঠিত দ্বিরুক্ত।
iv. লোকশিল্পের প্রতি আন্তরিক হলে ও সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করলে লোকশিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব।
লোকশিল্পের প্রতি আমাদের হৃদয় দিয়ে তাকাতে হবে। এর উন্নয়ন ও সংরক্ষণের জন্য সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে। লোকশিল্পের কর্মসংস্থান ও এর চাহিদা সৃষ্টির জন্য সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই আমরা আমাদের লোকশিল্প সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করতে পারব।

১২. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং অনুধাবন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

প্রস্ফুটিত পদ্মফুল সরোবরে অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। এই ফুল তার সৌন্দর্যের জন্য লোভনীয়ও বটে। ইচ্ছে হয় দিঘিতে ঝাঁপ দিয়ে মুঠিভরে গুচ্ছ গুচ্ছ পদ্মফুল তুলে আনি। কিন্তু পদ্মবনে কাঁটাঘেরা মৃণালের ঘন বেষ্টনী ভেঙে এই সুন্দর ফুল চয়ন করা বেশ কঠিন। এটা সত্য যে, যে-ব্যক্তি কাঁটার ভয়ে জলে নামতে চায় না তার পক্ষে দিঘির সুন্দর পদ্মফুল আহরণ কখনও সম্ভব নয়। এটাও সত্য যে, পৃথিবীতে যে কোনো কষ্ট সহ্য করতে চায় না তার পক্ষে মহৎ বা সুন্দর কিছু অর্জন করা কঠিন। জীবনে সাফল্য লাভ করতে হলে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হবে। যা দুর্লঙ্ঘ্য, তা জয় করতে হবে-তবেই সুখ ও সাফল্য আসবে।

i. 'প্রস্ফুটিত' শব্দের অর্থ কী? ১
ii. 'ফুল' শব্দের একটি সমার্থক শব্দ লেখ। ১
iii. 'গুচ্ছ গুচ্ছ' শব্দটি কোন ধরনের দ্বিরুক্তি? ১
iv. 'সুন্দর' শব্দটি কোন লিঙ্গ? ১
v. জীবনে সাফল্য কীভাবে অর্জিত হবে? ১

উত্তর :

i. 'প্রস্ফুটিত' শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বিকশিত।
ii. ফুল শব্দের একটি সমার্থক শব্দ- কুসুম।
iii. 'গুচ্ছ গুচ্ছ' হলো বিশেষ্য শব্দযুগলের বিশেষণরূপে ব্যবহারে গঠিত দ্বিরুক্তি।
iv. 'সুন্দর' শব্দটি উভয়লিঙ্গ।
v. প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করে তা জয় করলেই জীবনে সাফল্য আসবে। পদ্মবনের কাঁটার ভেতর মোহনীয় ফুল পদ্ম যেভাবে থাকে তেমনি সাফল্যও ঢাকা থাকে নানা বাধা-বিপত্তির আড়ালে। পদ্মফুলকে জয় করার ক্ষেত্রে কাঁটার ব্যথাকে অগ্রাহ্য করতে হয়। একইভাবে সকল বাধা-বিঘ্নকে তুচ্ছ করে সামনে এগিয়ে গেলেই সাফল্য অর্জিত হবে।

১৩. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং অনুধাবন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

তারপর ফিরে এসে যখন শুনল লাল গরুকে নিয়ে গেছে, তখন বিশুর কী কান্না। ছেলেমেয়েদের সবার মুখই ভার। মায়ের অবস্থাও তাই। সেদিন বাড়ির কারোরই ভালো করে খাওয়া হলো না। কিন্তু নিধিরামকে কেউ কিছু বললে না। কেউ কিছু বললে সে নিশ্চয়ই খুব রেগেমেগে উঠত। রাগবার জন্য মনে মনে তৈরি হয়েও ছিল। কিন্তু কেউ তাকে সেই সুযোগ দিল না। নিধিরাম এমন বিপদে আর কখনো পড়েনি। কী আশ্চর্য, এমন যে তেজস্বী নিধিরাম, সে যেন ঠান্ডা জল হয়ে গেল।

i. 'কী' কোন পদ? ১
ii. সেদিন কারোরই ভালো করে খাওয়া হলো না কেন? ১
iii. নিধিরামকে কেউ কোনোকিছু না বলার কারণ কী? ১
iv. বিপদে মানুষকে কেমন হতে হয়? ২

উত্তর :

i. 'কী' হলো সর্বনাম পদ?
ii. লাল গরুটাকে অন্য কেউ নিয়ে যাওয়ায় সবার মন খারাপ হয়েছিল। তাই সেদিন কারোরই ভালো করে খাওয়া হলো না।
iii. নিধিরামকে ঐ অবস্থায় কেউ কিছু বললে সে খুব রেগে যেত। তাছাড়া লাল গরুটার জন্য সবারই মন ভার ছিল। তাই নিধিরামকে কেউ কিছু বলল না।
iv. বিপদে পড়লে মানুষকে ধৈর্য ধারণ করতে হয়।
বিপদের সময় মানুষের উচিত মাথা ঠান্ডা রাখা। হুট করে কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়া। সবদিক ভেবে-চিন্তে স্থির সিদ্ধান্তে আসা। আর ভয় না পেয়ে মনে সাহস রাখা উচিত। তাহলেই বিপদ মোকাবেলা করা সহজ হয়।

১৪. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং অনুধাবন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

'ফুল পাখি নই, নইকো পাহাড়
ঝরণা সাগর নই
মায়ের মুখের মধুর ভাষায়
মনের কথা কই।
বাংলা আমার মায়ের ভাষা
শহিদ ছেলের দান
আমার ভাইয়ের রক্তে লেখা
ফেব্রুয়ারির গান।'

i. 'সাগর' শব্দের একটি প্রতিশব্দ লেখো। ১
ii. আমরা মনের কথা কোন ভাষায় বলি? ১
iii. কাদের আত্মত্যাগে আমরা বাংলা ভাষা পেয়েছি? ১
iv. ফেব্রুয়ারির গান রক্তে লেখা কেন? ২

উত্তর :

i. 'সাগর' শব্দের একটি প্রতিশব্দ হলো 'দরিয়া'।
ii. আমরা মনের কথা বাংলা ভাষায় বলি।
iii. ভাষাশহিদদের আত্মত্যাগে আমরা বাংলা ভাষা পেয়েছি।
iv. ফেব্রুয়ারি মাসে ভাষার জন্য রক্ত ঝরেছিল বলে ফেব্রুয়ারির গানকে রক্তে লেখা বলা হয়েছে।
১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে আন্দোলন করে বাংলার ছাত্র-জনতা। তাদের মিছিলে পুলিশ গুলি করলে অনেকে শহিদ হন। ভাষাশহিদদের এই মহান আত্মত্যাগের কারণেই বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা হয়েছে। তাই ফেব্রুয়ারির গান রক্তে লেখা।

১৫. নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং অনুধাবন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মানব সভ্যতার শত শত বছরের ইতিহাসের হৃদয়স্পন্দন সঞ্চিত থাকে বইঘরের ভাণ্ডারে। সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান -এসবের এক বিশাল সংগ্রহশালা এই বইঘর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

ভাষায় : "এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অৰরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।" শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শোনা যায়, বইঘর বা পাঠাগারের মধ্যে তেমনি মানুষের হৃদয়ের উত্থান–পতনের ধ্বনি শোনা যায়। পাঠক এখানে স্পর্শ পায় সভ্যতার এক শাশ্বত ধারার, অনুভব করে মহাসমুদ্রের শত শত বছরের কলেৱাল–ধ্বনি, শুনতে পায় জগতের এক মহা–ঐকতানের সুর; সেখানে অবিরাম চলতে থাকে কতশত হৃদয়ের কথোপকথন। বইঘর বা লাইব্রেরি মানুষের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন।

i. 'শ্বাশত' শব্দের অর্থ কী? ১
ii. 'বিশাল' শব্দটির দু'টি সমার্থক শব্দ লেখো। ১
iii. 'কথোপকথন' শব্দটির সন্ধি–বিচ্ছেদ করো। ১
iv. '... মানবাত্মার অমর আলোক কালো অৰরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।' –বাক্যটিকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করে দেখাও। ১
v. দুটি বাক্যের মাধ্যমে বইঘরের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরো। ১

উত্তর :

i. 'শ্বাশত' শব্দের অর্থ চিরস্থায়ী বা অনন্ত।
ii. 'বিশাল' শব্দটির দু'টি সমার্থক শব্দ হলো–বিরাট ও প্রকাণ্ড।
iii. 'কথোপকথন' শব্দটির সন্ধি–বিচ্ছেদ হলো : কথা + উপকথন।
iv. বাক্যটিকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করে দেখানো হলো– 'মানবাত্মার অমর আলো কালো অৰরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়ে আছে।'
v. বইঘরের বইয়ের ভান্ডারে শত শত বছরের জ্ঞান সঞ্চিত থাকে। এই বই পড়ে আমরা আলোকিত মানুষ হয়ে উঠি।

❑ অনুচ্ছেদ রচনা

বাক্য মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু সব সময় একটি বাক্যের মাধ্যমে মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এজন্য প্রয়োজন একাধিক বাক্যের। মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বাক্যের সমষ্টিই অনুচ্ছেদ। অনুচ্ছেদে কোনো বিষয়ের একটি দিকের আলোচনা করা হয় এবং একটি মাত্র ভাব প্রকাশ পায়। অনুচ্ছেদ রচনার ৰেত্রে কয়েকটি দিকে লৰ রাখা প্রয়োজন। যেমন–

ক) একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি মাত্র ভাব প্রকাশ করতে হবে। অতিরিক্ত কোনো কথা লেখা যাবে না।
খ) সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো বাক্যের মাধ্যমে বিষয় ও ভাব প্রকাশ করতে হবে।
গ) অনুচ্ছেদটি খুব বেশি বড় করা যাবে না।
ঘ) একই কথার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
ঙ) যে বিষয়ে অনুচ্ছেদটি রচনা করা হবে তার গুরবত্বপূর্ণ দিকটি সহজ–সরল ভাষায় সুন্দরভাবে তুলে ধরতে হবে।

১ বাংলা নববর্ষ

নববর্ষ সকল দেশের সকল জাতিরই আনন্দ উচ্ছ্বাস ও মঙ্গল কামনার দিন। বাংলাদেশেও পয়লা বৈশাখে সকলের কল্যাণ প্রত্যাশা করে মহা ধুমধামের সাথে নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল বাঙালি এই উৎসব পালন করে থাকে। বাঙালির জাতিসত্তা বিনির্মাণে এবং স্বাধীনতা অর্জনে নববর্ষের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সম্রাট আকবরের সময় বাংলা সনের গণনা শুরব হয় বলে ধরণা করা হয়। জমিদার ও নবাবেরা নববর্ষে পূণ্যাহ আয়োজন করতেন। পরবর্তিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবার বিশেষ গুরবত্ব দিয়ে নববর্ষ পালন করায় সে আয়োজন দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। নববর্ষে হালখাতা, বৈশাখী মেলা, ঘোড়দৌড় এবং বিভিন্ন লোকমেলার আয়োজন করে সাধারণ মানুষ। সংস্কৃতি সংগঠন ছায়ানট নববর্ষে রমনার বটমূলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারবকলা বিভাগ আয়োজন করে মঙ্গল শোভাযাত্রা। এছাড়াও নানা বর্ণিল আয়োজনে দিনটিকে বরণ করা হয়। ছেলেরা পাজামা–পাঞ্জাবি এবং মেয়েরা নানা রঙের শাড়ি পড়ে উৎসবে মাতোয়ারা হয়। এই দিনে প্রত্যেক বাঙালি নিজের, বন্ধুর, পরিবার ও দেশের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে।

২ ছাত্রজীবন

ছাত্রজীবন মানবজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়। বিদ্যাশিৰার সূচনা থেকে মানুষ জীবনের যে সময়টুকু স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোনো শিৰালয়ে অতিবাহিত করে, তা–ই ছাত্রজীবন। 'ছাত্রনং অধ্যানং তপ' অর্থাৎ অধ্যয়নই হচ্ছে ছাত্রজীবনের একমাত্র তপস্যা। এই বিষয়টি প্রত্যেক ছাত্রকে স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে। ছাত্ররাই দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার ও জাতির আশা–ভরসার প্রতীক। দেশ ও জাতিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার গুরবদায়িত্ব ভবিষ্যতে ছাত্রদের ওপরই বর্তায়। সে গুরবদায়িত্ব সার্থকতার সাথে বহন করার জন্যে তাদেরকে উপযুক্ত হতে হবে। আধুনিক বিশ্বের নানান খবরাখবর সংগ্রহ এবং তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা একজন ছাত্রের জন্যে অত্যন্ত জরবরি। পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে ছাত্রদের অংশগ্রহণ থাকা প্রয়োজন। কর্মজীবনে প্রবেশের সোপান হচ্ছে ছাত্রজীবন। ছাত্রজীবনের সফলতা ও ব্যর্থতার ওপর কর্মজীবন অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ সময় থেকেই জীবন সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। একজন ছাত্রকে অবশ্যই কুসংসর্গ ত্যাগ করে সততা, সংযম ও পরিশ্রমের সমন্বয়ে আদর্শ মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

৩ সততা

সততা মানবচরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি গুণ। সর্বদা সত্য কথা বলা, সৎপথে চলা এবং কোনো অন্যায় কাজে লিপ্ত না হওয়ার নামই সততা। একথায় সত্যের অনুসারী মানুষের সৎ থাকার গুণকে সততা বলা হয়। এই গুণ অর্জনের চেষ্টা ও চর্চা একজন মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে মর্যাদা ও গৌরবের আসনে। নিষ্ঠার সঙ্গে নিরলস অনুশীলনের মাধ্যমে এই গুণ অর্জন করা যায়। আর এই গুণ যিনি অর্জন করতে পারেন তিনিই সমাজে আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে থাকেন। সততাকে তাই মানবচরিত্রের অলঙ্কার বলা হয়। সততার সুফল শত ধারায় বিকশিত। জীবনকে সুন্দর সফল ও সার্থক করার জন্য সৎ থাকার অভ্যাস করতে হয়। সৎগুণসম্পন্ন মানুষ কখনোই অন্যায় ও অবৈধ কাজে লিপ্ত থাকতে পারে না। সৎ লোক মাত্রই চরিত্রবান ও মহৎ হয়ে থাকে। তাই সে সবার বিশ্বাসভাজন ও শ্রদ্ধেয় হয়। সততা মানুষের নৈতিকতাকে সমুন্নত করে। সৎ ব্যক্তি কখনোই অন্যায়ের কাছে মাথা নত করে না। একটি সমৃদ্ধ ও আদর্শ জীবন গড়ার জন্য সততার বিকল্প নেই। শিৰার্থীদের উচিত ছাত্রজীবন থেকেই সৎ গুণগুলো অনুশীলন করা। তাহলেই তারা পরিবার ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করতে পারবে।

৪ ছবি আঁকা

মানুষ ভাবতে ভালোবাসে। মানুষের মনে যেসব ভাবনা খেলা করে ছবিতে সেসবের শিল্পময় প্রকাশ ঘটে। কে কখন ছবি আঁকা শুরব করেছিল তা বলা মুশকিল। তবে মানুষের আঁকা সবচেয়ে পুরোনো

ছবির কথা জানা যায়। ১১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে স্পেনে আলতামিরা নামক এক গুহায় প্রথম মানুষের আঁকা ছবির সন্ধান মেলে। যেকোনো মানুষই ছবি আঁকে। এমন কোনো মানুষ নেই যে জীবনে কোনো দিন ছবি আঁকেনি। যেকোনো ছবি, হতে পারে তা কোনো পশু, পাখি, মাছ, আম, জাম, কাঁঠাল, পেঁপে, এ কোনো না কোনোটি মানুষ জীবনে একবার হলেও এঁকেছে। আঁকতে আঁকতে অনেকের ছবি আঁকাটাই নেশা হয়ে যায় এবং জীবনে ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। ছবি-আঁকা নিয়েই তাদের স্বপ্ন, ছবি-আঁকাই তাদের পেশা হয়ে যায়। তারা নিজেদের প্রতিভার প্রকাশ ঘটায় ছবি-আঁকার মধ্য দিয়ে। পৃথিবীতে অনেকে বিখ্যাত হয়েছেন শুধু ছবি এঁকে।

৫ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনের এক উজ্জ্বলতম দিন। ১৯৫২ সালের এ দিনে মাতৃভাষার মর্যাদা রৰায় রাজপথে প্রাণ দিয়েছিল বাংলার দামাল ছেলেরা। তাদের সেই আত্মত্যাগের বিনিময়েই নিশ্চিত হয়েছে মায়ের ভাষা বাংলায় কথা বলার অবারিত অধিকার। সেই ঐতিহাসিক ভাষা শহিদদিবস ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেব স্বীকৃতি লাভ করেছে। কানাডা প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠন 'মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ অব দ্যা ওয়ার্ল্ড' প্রথম ২১শে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা আলোর মুখ দেখেনি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপিত হয়। বিশ্বের ২৭টি দেশ এ প্রস্তাবকে সমর্থন জানায়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কোর ২১ তম অধিবেশনে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বর্তমানে বিশ্বের সকল দেশ এই দিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করছে। বাংলাদেশের শহিদদের মহান ত্যাগ এভাবে বিশ্ববাসীর স্বীকৃতিলাভ করেছে। বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জন্য এটি একটি বিরল গৌরব। বাংলা ভাষা শহিদ ভাইদের জীবনের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি। তাই এই ভাষাকে আমরা শ্রদ্ধা করব, শুদ্ধভাবে এ ভাষার চর্চা করব। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এটিই হোক সকলের শপথ।

৬ দুর্নীতি

জাতীয় জীবনে উন্নতির অন্যতম অন্তরায় দুর্নীতি। আমাদের জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রকোষ্ঠে দুর্নীতি এমনভাবে প্রবেশ করেছে যে, আজকাল একে এড়িয়ে আমাদের চলাই দায়। অফিস–আদলতে, পেশায়–নেশায়, ঘরে–বাইরে, রাজনীতি কিংবা ধর্মনীতি সর্বৰেত্রে দুর্নীতির সর্বগ্রাসী প্রভাব বিদ্যমান। দুর্নীতি যেন সভ্য সমাজে স্বাভাবিক বিষয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরপর বেশ কয়েকবার বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। দুর্নীতির কারণে বিদেশি বিনিয়োগ ব্যাহত হচ্ছে, সাহায্যের হাতও গুটিয়ে নিচ্ছে ধনী দেশগুলো। দুর্নীতির অবাধ বিস্তার সামাজিক ৰেত্রে নব্য ধনিকশ্রেণীর সৃষ্টি করছে, জন্ম দিচ্ছে নানামুখী বৈষম্য। সন্ত্রাস নামক যে ভয়ংকর দানব সমাজকে নিরাপত্তাহীন করে তুলেছে তার পেছনেও রয়েছে দুর্নীতির প্রভাব। দুর্নীতি জন্ম দিয়েছে মূল্যবোধহীনতা যা সমাজকে অবৰয়ের অতলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে দুর্নীতি এক দুরারোগ্য ব্যাধি, দুর্বিষহ অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। এর করাল গ্রাসে জাতীয় উন্নতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। মেধা ও পরিশ্রমের যথাযথ মূল্যায়ণ হচ্ছে না। বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। দেশের সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। স্বনির্ভর জাতি গড়ে তোলার জন্য দুর্নীতি নামক এই অভিশাপকে রবখতে হবে এখনই। সকলের সম্মিলিত অঙ্গীকারই পারে এর প্রভাব কমিয়ে আনতে।

৭ সকাল বেলা

সকাল বেলা আমার সবচেয়ে প্রিয় সময়। এ সময়ের শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশ আমাকে খুব আকর্ষণ করে। আমি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে আমার বাড়ির পাশের নদীর তীরে হাঁটতে যাই। সেখান থেকে সকালের সূর্যোদয় দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। সকালের শীতল বাতাস আমার দেহমন জুড়িয়ে দেয়। নানা রকম পাখির কলকাকলিতে পরিবেশটা মুখরিত হয়ে ওঠে। এ সময় কৃষকেরা গরব নিয়ে হাল চাষ করতে বের হয়। গ্রামের মসজিদে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সমস্বরে কোরআন তেলাওয়াত করে। কিছুৰণ হাঁটাহাঁটি করে আমি বাড়ি ফিরে নাস্তা করে পড়তে বসি। তারপর বন্ধুদের সাথে মিলে স্কুলে যাই। ছুটির দিনে সকাল বেলা আমি বাবাকে নানা কাজে সাহায্য করি। সকাল বেলা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠলে আমার সারাটা দিন খুব ভালো কাটে।

৮ আমার মা

পৃথিবীতে মা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। অনেক কষ্ট স্বীকার করে তিনি আমাদের জন্ম দেন। অনেক স্নেহ–মমতায় বড় করে তোলেন। আমার কাছে আমার মা সবচেয়ে প্রিয়। মাকে ছাড়া আমি একটি মুহূর্তের কথাও ভাবতে পারি না। মা আমাকে অনেক ভালোবাসেন। সব সময় আমাকে নিয়ে ভাবেন। আমি দুপুরে স্কুল থেকে বা সন্ধ্যায় মাঠ থেকে ফিরতে দেরি করলে মা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। আমাকে না খাইয়ে কখনো খান না। আমার অসুখ হলে মা আমার যত্ন করেন। রাত জেগে আমার পাশে বসে থাকেন। মা–ই আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আমি মায়ের কাছে কোনো কিছুই গোপন করি না। মা আমাকের কখনোই বকেন না। ভালো পথে চলার জন্য সব সময় পরামর্শ দেন। মা আমার সেরা শিৰক। আমার পড়া তৈরিতে তিনি সাহায্য করেন। কঠিন বিষয়গুলো মা সহজেই বুঝিয়ে দেন। আমি মাকে কখনোই কষ্ট দিই না। সবসময় মায়ের কথামতো চলতে চেষ্টা করি। বাড়ির ছোটোখাটো কাজে মাজে সাহায্য করি। আমার মাকে আমি অনেক শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি।

৯ আমাদের লোকশিল্প

দেশি জিনিস দিয়ে দেশের মানুষের হাতে তৈরি শিল্প সম্মত দ্রব্যকেই লোকশিল্প বলা হয়। বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাপন ও গ্রামীন ঐতিহ্যের সাথে লোকশিল্পের নিবিড় যোগাযোগ বিদ্যমান। নানা ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পে আমাদের দেশ সমৃদ্ধ। ঢাকাই মসলিন নিয়ে আজ অবধি আমরা গর্ববোধ করি। লুপ্তপ্রায় নকশি কাঁথা আমাদের গ্রামীণ ঐতিহ্যের স্মারক। আমাদের দেশের লোকশিল্প বিভিন্ন রূ পে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে প্রাধান্য পেয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা, টাঙ্গাইল, সাহজাদপুর, কুমিলরা, চট্টগ্রাম এলাকার তাঁতশিল্প উলেরখযোগ্য। এ ছাড়াও নারায়ণগঞ্জের জামদানি, খুলনার মাদুর, সিলেটের শীতল পাটি আমাদের সবার পরিচিত। বাংলাদেশের মৃৎশিল্পীদের তৈরি পোড়ামাটির কলস, হাঁড়ি, পাতিল, সানকি, ফুলদানি, পুতুল ও আমাদের লোকশিল্পের গুরবত্বপূর্ণ অংশ। গ্রামের ঘরে ঘরে শিকা, হাতপাখা, বাঁশের তৈরি জিনিসপত্র, কাপড়ের পুতুলও আমাদের দেশের মানুষের রবচির পরিচায়ক। লোকশিল্প যেমন আমাদের দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে তেমনি বিদেশী মুদ্রা উপার্জনেও অবদান রাখে। এর ভেতর দিয়ে দেশের অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করা সম্ভব। তাই লোকশিল্পের সংরৰণ ও সম্প্রসারণের জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

১০ পরিবেশ দূষণ

মানুষসহ অন্যান্য জীবজন্তু পরিবেশ ও প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতির দানেই মানুষ নানা অঙ্গিকে নিজের জীবনকে সাজিয়ে তুলেছে। অথচ অবিবেচক মানুষদের কারণেই পরিবেশ আজ ক্রমান্বয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে পরিবেশ দূষণের পেছনে মানুষের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। জনসংখ্যার বিস্ফোরণের কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ– বায়ু, পানি, মাটির ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ছে। বনজ সম্পদ ধ্বংসের রীতিমতো উৎসব চলছে বিশ্বজুড়ে। ফলে পরিবেশ দূষণের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে। বাতাসে ধুলোবালি, কলকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া, কীটনাশক ইত্যাদির উপস্থিতি বাড়ছে আশংকাজনকভাবে। কলকারখানার বর্জ্য, কীটনাশক ইত্যাদি পানিকে করে তুলেছে বিষাক্ত। হাজারো রকমের উৎকট শব্দের কারণে শব্দ দূষণ ঘটছে। নষ্ট হচ্ছে মনের শান্তি। ৰতিকর রাসায়নিক ও যত্রতত্র আবর্জনা ফেলায় দূষিত হচ্ছে মাটি। এভাবে দূষিত হতে থাকলে এক সময় পরিবেশের ভারসাম্য সম্পূর্ণরূ পে নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে এই বিশ্ব জীবের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠবে। অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব আজ মারাত্মক হুমকির মুখে। তাই পরিবেশ দূষণ যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে সবারই ভূমিকা রাখা উচিত। সকলের সচেতনতাই আমাদের পরিবেশকে সুস্থ ও সুন্দর করে তুলতে পারে।

১১ বইমেলা

বই মানবসভ্যতার অন্যতম প্রাণসত্তা। বই মানুষকে পূর্ণতা দেয়, জীবনকে করে সমৃদ্ধ। বইমেলা প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অংশ। বইমেলা উপলৰে বই বিক্রেতা ও প্রকাশকরা নানা সাজে বইয়ের স্টল বা দোকান সাজিয়ে বাসেন। এখানে বিভিন্ন ধরনের বইয়ের সমাহার ঘটে। বইমেলা উপলৰে প্রচুর নতুন বই মেলায় আসে। প্রতিষ্ঠিত লেখকদের পাশাপাশি নতুন লেখকদের বইও পাওয়া যায় এখানে। প্রতিদিন বইয়ের আকর্ষণে বই প্রেমিক মানুষেরা মেলা প্রাঙ্গণে ছুটে আসে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি লেখক, ভাষাবিদ ও বরেণ্য ব্যক্তিত্বরা বইমেলায় আসেন। লেখক ও পাঠকদের মিলনমেলায় রূ প নেয় এই মেলা। বইমেলার ফলে পাঠকরা এক জায়গা থেকে তাদের পছন্দের বই কিনতে পারে। এছাড়া বই কেনার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহও তৈরি হয়। বইমেলা আমাদের সাহিত্য–সংস্কৃতিবোধ জাগ্রত করে। সবাইকে বই পড়ার প্রতি অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে একটি মননশীল জাতি গঠনের ৰেত্রে বইমেলার গুরবত্ব অপরিসীম।

১২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে সবচেয়ে গুরবত্বপূর্ণ ঘটনা। একসাগর রক্তের বিনিময়ে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাঙালি জাতির কাছে স্বর্ণময় এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস–ঐতিহ্যকে সংরৰণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তা জানানোর জন্য সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। ১৯৯৬ সালের ২২শে মার্চ ঢাকাস্থ সেগুনবাগিচার একটি দোতলা ভবনে প্রতিষ্ঠা করা হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। বাংলাদেশের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ–সংক্রান্ত তথ্য, প্রমাণ, বস্তুগত নিদর্শন, রেকর্ডপত্র ও স্মারকচিহ্নসমূহ সংগ্রহ, সংরৰণ ও প্রদর্শনের সুব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে। দোতলা বিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মধ্যে রয়েছে ছয়টি গ্যালারি : নিচ তলায় তিনটি ও দোতলায় তিনটি। প্রথম গ্যালারির নিদর্শনগুলো দুটি পর্বে বিন্যস্ত। প্রথম পর্বে প্রদর্শিত হয়েছে বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। দ্বিতীয় পর্বে প্রদর্শিত হয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরবদ্ধে বিভিন্ন সংগ্রামের চিত্র। দ্বিতীয় গ্যালারিতে তুলে ধরা হয়েছে পাকিস্তান আমলের ইতিহাস। দোতলার তিনটি গ্যালারি সাজানো হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন তথ্য, প্রমাণ ও চিত্র দিয়ে। প্রতিটি গ্যালারিতে আছেন একজন চৌকশ গাইড। তিনি দর্শনার্থীদের নানা প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে তাদের কৌতূহল নিবৃত করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর চত্বরে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নানারকম বই, পোস্টার, ক্যাসেট, সিডি, স্মারকসামগ্রী বিক্রির জন্য একটি পুস্তকবিপণি, একটি খাবারের দোকান ও একটি উন্মুক্ত মঞ্চ এবং সামনের অংশে আছে ১০০ আসন বিশিষ্ট একটি চমৎকার অডিটোরিয়াম। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস–ঐতিহ্য সম্পর্কে দেশের মানুষকে সচেতন করতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অডিটোরিয়ামে ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে আমন্ত্রিত দর্শকদের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়। উন্মুক্ত মঞ্চে আয়োজন করা হয়ে থাকে নানা অনুষ্ঠানের। জাদুঘর আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরবত্বপূর্ণ স্মৃতি–স্মারক–দলিলপত্রের একমাত্র সংগ্রহশালা। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সঠিকভাবে জানতে পারে, ভুলে না যায়, সে লৰ্যই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্টিত ও পরিচালিত হয়ে আসছে।

১৩ ডিজিটাল বাংলাদেশ

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বর্তমান সময়ে অত্যন্ত আলোচিত একটি বিষয়। উন্নত দেশগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এটি একটি সময়োচিত পদৰেপ। ডিজিটাল বাংলাদেশ কী, এ বিষয়কে বুঝতে হলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে একটি দেশ কীভাবে ডিজিটাল দেশে পরিণত হতে পারে। একটি দেশকে তখনই ডিজিটাল দেশ বলা যাবে যখন তা ই–স্টেটে পরিণত হবে। অর্থাৎ ওই দেশের যাবতীয় কাজ যেমন– সরকারব্যবস্থা, শাসনব্যবস্থা, ব্যবসায়–বাণিজ্য, শিৰা, চিকিৎসা, কৃষি প্রভৃতি কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। তাই একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ডিজিটাল বাংলাদেশ একটি গুরবত্বপূর্ণ প্রত্যয়। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহারে একটি গুরবত্বপূর্ণ দিক ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার। ২০২১ সালে পালিত হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। সেই লৰ্যে এ সময়ের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লৰ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে একটি ডিজিটাল সমাজ নিশ্চিত করবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, যেখানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সমস্ত কর্মকাণ্ডে অনলাইন প্রযুক্তির প্রয়োগ নিশ্চিত হবে। কার্যকর তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি সুশাসিত সমাজব্যবস্থা নিশ্চিত করাই ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ প্রকল্পের মূল লৰ্য। এৰেত্রে সবার আগে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী তথ্যপ্রযুক্তি কাঠামো গড়ে তোলা। সেই লৰ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতির সমাধান, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কাঠামোর উন্নয়ন ও ইন্টারনেট ব্যবহারে প্রশিৰণ, ইংরেজি শিৰার ব্যবহারসহ বিভিন্ন পদৰেপ নিতে হবে। বিশ্বায়ন সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি দ্রবত প্রসারের ফলে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে ডিজিটাল উন্নয়নের চলমান প্রক্রিয়ায়। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ নামক প্রকল্পের সাথে সাধারণ মানুষের যোগসূত্র তৈরি করতে হবে। তবেই উন্নত, আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের এই স্বপ্ন পূরণ হবে।

১৪ শীতের সকাল

শীতের সকাল অন্যসব ঋতু থেকে আলাদা। কুয়াশার চাদরে মোড়া শীতের সকাল হাড় শীতল করা ঠান্ডা নিয়ে দেখা দেয়। এ সময় এক ফালি রোদ সকলের কাছে বহুল প্রতীৰিত হয়ে ওঠে। শীতের

সকালে মানুষের মাঝে এক অজানা অলসতা ভর করে। লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকাতেই যেন তখন স্বর্গীয় সুখ অনুভূত হয়। কুয়াশার অন্ধকারে সূর্যদেবতার দেখা পাওয়া ভার। তাই সকালের উপস্থিতি টের পাওয়াও কষ্টকর। কিন্তু জীবনের বাস্তবতা শীতকেও দূরে সরিয়ে দেয়। তাই আড়মোড়া ভেঙে উঠতেই হয় সকলকে। নিজেকে তৈরি করে নিতে হয় কাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। শীতের সকালে প্রকৃতি ও প্রাণীর মধ্যে এক ভিন্ন আমেজ লৰ করা যায়। মানুষ, জীবজন্তু, পাখ–পাখালি শীতের বেলায় সূর্যের প্রত্যাশায় প্রহর গুনতে থাকে। শীতের সকালের প্রকৃত আনন্দ গ্রামীণ জীবনেই খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার গ্রামগুলোতে শীতের সকাল বেশ মনোরম হয়। গ্রামের মাঠে মাঠে শীতের প্রভাব বেশ চোখে পড়ে। শীতের কুয়াশা ভেদ করে নিজ নিজ গৃহপালিত প্রাণীদের নিয়ে বের হয় গ্রামের কর্মঠ মানুষেরা। সূর্যের দেখা পাওয়া মাত্রই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রোদ পোহাতে শুরব করে। গ্রামের মানুষেরা খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে শীতকালে উষ্ণতা খুঁজে ফিরে। শীতের সকালে গ্রামের সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত হলো পিঠা–পুলি খাওয়ার মুহূর্ত। গাছে গাছে খেজুরের রসের হাঁড়ি ঝুলিয়ে রাখতে দেখা যায়। এ রস দিয়ে নানা রকম পিঠা বানানো হয়। গ্রামীণ জীবনের আবেদন ইট–কাঠ–পাথরের শহুরে জীবনে পাওয়া যায় না। শহরে দেখা যায় বারান্দায় বসে রোদ পোহানোর দৃশ্য কিংবা গরম চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে খবরের কাগজ পড়ার দৃশ্য। লেপ জড়ানো কর্মব্যস্ত মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের পরেও আরও একটু ঘুমিয়ে নিতে চায়। কিন্তু জীবিকার টানে তকে আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠতেই হয়। সর্বোপরি সকলের কাছেই শীতের সকাল হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যময়।

৪. পত্র রচনা

❑ **চিঠি বা পত্র :**
চিঠির আভিধানিক অর্থ হলো স্মারক বা চিহ্ন। তবে ব্যবহারিক অর্থে চিঠি বা পত্র লিখন বলতে বোঝায়, একের মনের ভাব বা বক্তব্যকে লিখিতভাবে অন্যের কাছে পৌঁছানোর বিশেষ পদ্ধতিকে। আরও সহজ করে বলা যায়, দূরের কিংবা কাছের কোনো আত্মীয়–স্বজন বা বন্ধু–বান্ধবের কাছে নিজের প্রয়োজনীয় কথাগুলো লিখে জানানোর পদ্ধতিকে চিঠি বা পত্র লিখন বলে।

❑ **চিঠি বা পত্রের বিভিন্ন অংশ :**
একটি চিঠি বা পত্রে সাধারণত ছয়টি অংশ থাকে। এগুলো হলো– ১. যেখান থেকে চিঠি লেখা হচ্ছে সে জায়গার নাম ও তারিখ; ২.সম্বোধন বা সম্ভাষণ; ৩. মূল বক্তব্য; ৪. বিদায় সম্ভাষণ; ৫. প্রেরকের (যে চিঠি পাঠাচ্ছে তার) স্বাৰর ও ৬. প্রাপকের (যে চিঠি পাবে তার) নাম ও ঠিকানা।

❑ **চিঠি বা পত্র লেখার নিয়ম :**
চিঠি বা পত্র লেখার সময় সাধারণ কয়েকটি নিয়ম পালন করতে হয়। যেমন– ১. সুন্দর ও স্পষ্ট হস্তাৰরে লেখা; ২. সহজ, সরল ভাষায় লেখা; ৩. নির্ভুল বানানে লেখা; ৪. চলিত ভাষায় লেখা; ৫. বিরামচিহ্নের যথাযথ ব্যবহার করা; ৬. একই কথার পুনরাবৃত্তি না করা; ৭. পাত্রভেদে সম্মান ও স্নেহসূচক বাক্য ব্যবহার ইত্যাদি।

❑ **চিঠি বা পত্রের প্রকারভেদ :**
বিষয়বস্তু বিবেচনায় চিঠিকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা–

১. ব্যক্তিগত চিঠি। যেমন– মা-বাবা বা বন্ধু-বান্ধবকে ব্যক্তিগত বিষয় উলেৱখ করে লেখা চিঠি।
২. সামাজিক চিঠি। যেমন– সামাজিক কোনো সমস্যা জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য কিংবা প্রশাসনকে জানানোর জন্য লেখা চিঠি।
৩. ব্যবহারিক চিঠি। যেমন– ব্যবহারিক প্রয়োজনে লেখা আবেদনপত্র, ব্যবসাপত্র, নিমন্ত্রণপত্র ইত্যাদি।

❑ ব্যক্তিগত পত্র :
[পাঠ্য বই থেকে]

১. মনে করো, তোমার নাম নিবিড়। তোমার বন্ধুর নাম রাহুল। সে খুলনায় থাকে। বৃৰরোপণের প্রয়োজনীয়তা উলেৱখ করে তার কাছে একটি পত্র লেখ।

পলৱবী ঢাকা
১৩.০৭.২০১৬

প্রিয় রাহুল,

আমার শুভেচ্ছা নিও। অনেক দিন হলো তোমার কোনো খবর পাই না। আশা করি ভালো আছ। গতদিন আমাদের স্কুলে ‘বৃৰরোপণের প্রয়োজনীয়তা’ বিষয়ে একটি সেমিনার হয়ে গেল। সেই সেমিনারেই বৃৰরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো কথা শুনলাম। তোমাকে সেগুলো জানাতেই এ চিঠি লিখতে বসেছি।

তুমি তো জানো, গাছ আমাদের পরম বন্ধু। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসে অক্সিজেন গ্রহণ করি, কার্বন-ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করি। আর গাছ আমাদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে নেয়, পরিবেশের ভারসাম্য রৰা করে। কিন্তু মানুষ তার প্রয়োজনে প্রচুর গাছ কাটছে। বন উজাড় হচ্ছে। তাতে প্রকৃতি ও পরিবেশের ভীষণ ৰতি হচ্ছে। তুমি হয়তো জানো না, পরিবেশের ভারসাম্য রৰার জন্য একটি দেশের মূল ভূ-খণ্ডের কমপৰে পঁচিশ ভাগ বন থাকা দরকার। আমাদের দেশে তা নেই। বরং যা আছে তা-ও নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে। সভ্যতা ও উন্নয়নের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে কলকারখানা। রাস্তায় যানবাহনের চলাচল বাড়ছে। কলকারখানা ও গাড়ির ধোঁয়ায় বাতাসে বাড়ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ। কমছে বাতাসের ওজোন স্তর। সৃষ্টি হচ্ছে গ্রিনহাউজ ইফেক্ট। ফলে মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। দেখা দিচ্ছে নানা রোগ-ব্যাধি। এসবই ঘটছে বাতাসে অক্সিজেনের অভাবের কারণে। তাই বেশি বেশি গাছ লাগালে বাতাসে অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ হবে। প্রকৃতির ভারসাম্য ফিরে আসবে। পরিবেশ দূষণমুক্ত হবে। তাছাড়া আমাদের জ্বালানির চাহিদার বেশিরভাগ পূরণ হয় বৃৰের মাধ্যমে। কাঠ থেকে আমরা বাড়িঘর এবং আমাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রস্তুত করে থাকি। সুতরাং

ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখনই আমাদের অধিক হারে বৃৰরোপণ করা প্রয়োজন। বাড়ির চারপাশে, রাস্তার দুপাশে, পতিত জমিতে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে। বৃৰরোপণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণকে আরো সচেতন করে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, বৃৰ বাঁচলে আমরা বাঁচব।

আজ এই পর্যন্তই। তোমার মা-বাবাকে আমার শ্রদ্ধা জানিও। চিঠি দিও।

ইতি–
তোমার বন্ধু
নিবিড়।

		ডাক টিকিট
প্রেরক:	প্রাপক:	
নিবিড় সেতু	মো. রাহুল	
পলৱবী, মিরপুর,	সোনারতরী	
ঢাকা।	৩৩ স্যার ইকবাল রোড, খুলনা।	

২. তোমার বন্ধু মুমতাহিনার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তাকে সান্ত্বনা জানিয়ে একটি চিঠি লেখ।

লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।
২৫.০৬.২০১৬

সুপ্রিয় মুমতাহিনা,

কিছুৰণ আগে তোমার চিঠি পেয়েছি। চিঠি পড়ে আমি স্তম্ভিত। তুমি লিখেছ তোমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যুর কথা। আমার কাছে এখনো সব অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো! আমি খুবই মর্মাহত। তোমাকে সান্ত্বনা দেবার মতো ভাষা আমার নেই। শুধু জেনো, তোমার এ মর্মবেদনার আমিও সমান অংশীদার।

ছোটবেলায় আমি মাকে হারিয়েছিলাম। মায়ের আদর–ভালোবাসা কাকে বলে জানতাম না। তোমার মা আমার সেই অনুভূতি জাগিয়েছিলেন। তাই তাঁকে আমি মা বলে ডেকেছি। আজ আমি আবার মা-হারা হলাম। মানুষ মরণশীল– এই নির্মম সত্যটা আমাদের জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। কাজেই দুঃখ না করে মায়ের আত্মার শান্তির জন্য তিনি যেমনটি ভেবেছিলেন ভবিষ্যতে আমাদের সেদিকে মনোযোগ দিতে হবে। পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ করো। বাবা ও ছোট ভাইয়ের প্রতি খেয়াল রেখ। কয়েক দিন পরে তোমার দ্বিতীয় সেমিস্টার পরীৰা। নিজের পড়ার কাজে ডুবে থাকলে এ বেদনা হয়তো আস্তে আস্তে প্রশমিত হবে।

পরীৰার কারণে আমি তোমার এই দুঃসময়ে কাছে থাকতে পারলাম না, এটাও আমার জন্য খুব কষ্টকর। কায়মনোবাক্যে কামনা করি, তুমি এই প্রতিকূলতা যেন কাটিয়ে উঠতে পারো। আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল। আলৱাহ তোমার সহায় হোন।

তোমার বাবাকে সালাম জানিও। ছোট ভাই সিয়ামের প্রতি রইল আমার অসীম স্নেহ।

ইতি–
তোমার বন্ধু
সুমনা।

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

৩. মনে করো, তোমার ছোট ভাই মুগ্ধ ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। তাকে 'পরীৰায় অসদুপায় অবলম্বন ব্যক্তি তথা জাতির জন্য হুমকিস্বরূপ' এই মর্মে একটি পত্র পাঠাও।

সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
১৭.০৭. ২০১৬

স্নেহের মুগ্ধ,

আমার আদর নিও। গতকাল তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি ও বাড়ির সবাই ভালো আছ জেনে খুশি হয়েছি।

চিঠিতে জানতে পারলাম আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে তোমার পরীৰা শুরু হবে। তোমার পড়াশোনা নিশ্চয়ই ভালোভাবে চলছে? মনোযোগ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো পড়ো এবং বারবার লেখো। নিজের ভুলগুলো নিজেই সংশোধন করো। এতে তোমার হাতের লেখা যেমন সুন্দর হবে, তেমনি লেখায় বানান ভুলও কমে যাবে। ফলে পরীৰার খাতায় বেশি নম্বর পাবে।

আজকাল অনেক শিৰার্থীই ক্লাসে মনোযোগ দিয়ে শিৰকদের কথা শোনে না। বাড়িতেও ঠিকমতো পড়ালেখা করে না। তারা পরীৰার হলে গিয়ে নকল করে। কেউ কেউ নকল করে ভালোভাবে পাসও করে যায়। কিন্তু প্রকৃত শিৰা তাদের হয় না। ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যৎ। আগামীতে তারাই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে। তাই পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে তাদের নিজেকে সব দিক দিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। পরীৰায় নকল করা একটি সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধি জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। নকলের মতো দুর্নীতি বা পাপের ওপর ভিত্তি করে জীবনে কখনোই সাফল্য লাভ করা যায় না। আশা করি, তুমি শিৰকদের উপদেশ মতো পড়াশোনার প্রতি গভীর মনঃসংযোগ করবে। মানুষের মতো মানুষ হয়ে আমাদের পরিবার ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। তোমার কৃতিত্ব ও গৌরব কামনা করি। ভালো থেকো। বাবা ও মাকে আমার সালাম জানিও।

ইতি–
বাঁধন ভাইয়া ।

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

৪. কম্পিউটার শিৰার গুরুত্ব বর্ণনা করে তোমার ছোট বোন বনানীকে একটি চিঠি লেখ।

আহসান রোড, খুলনা।
১৭.০৭.২০১৬

প্রিয় বনানী,

আমার স্নেহাশিস নিও। অনেক দিন পর তোমার চিঠি পেলাম। তুমি ক্লাসে প্রথম হয়েছ জেনে খুব আনন্দিত হয়েছি। আমি আরো খুশি হয়েছি তুমি ক্লাসের পড়াশোনার বাইরে কম্পিউটার শিখছ বলে।

বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। আর প্রযুক্তির এ যুগে সর্বোচ্চ স্থান দখল করে আছে কম্পিউটার। কম্পিউটার

ছাড়া আধুনিক জীবন-যাপন কল্পনা করা যায় না। শিৰা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, ব্যবসাবাণিজ্য, অফিস-আদালত, চিকিৎসা, বিনোদন– সব ৰেত্রেই কম্পিউটারের ব্যবহার আজ অপরিহার্য। তাই কর্মৰেত্রেও এখন কম্পিউটার জানা লোকদের অগ্রাধিকার। কম্পিউটার–অভিজ্ঞ লোক বেকার বসে থাকে না। তাই বর্তমান শিৰা ব্যবস্থায় কম্পিউটার শিৰার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আমাদের প্রত্যেকেরও উচিত অন্যান্য বিষয়ের সাথে কম্পিউটার শিৰার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। তুমি ক্লাসের পড়াশোনার পাশাপাশি কম্পিউটার ভালোভাবে আয়ত্ত করবে, আমার এই শুভ কামনা রইল।

আজ আর না। মা ও বাবাকে আমার সালাম দিও। তুমি ভালো থেকো।

ইতি–
তোমার ভাইয়া
রনি

		ডাক টিকিট
প্রেরক: রনি ১০৪, আসহান রোড বগুড়া।	প্রাপক: ব্রততী বনানী গ্রাম : শ্রীপুর ডাকঘর : বকসিগঞ্জ জেলা : জামালপুর।	

[অতিরিক্ত অংশ]

৫. মনে করো, তুমি কাজল। তোমার জেএসসি পরীৰার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। পরীৰার ফলাফল সম্পর্কে জানিয়ে বাবার কাছে একটি পত্র লেখো।

বাজিতপুর
ডিসেম্বর ২৫, ২০১৬

শ্রদ্ধেয় বাবা,

সালাম নিন। আশা করি ভালো আছেন। গতকাল আপনার চিঠি পেলাম। আপনার আসতে দেরি হবে জেনে মনটা বেশ খারাপ হলো।

আজ আমার জেএসসি পরীৰার ফল প্রকাশিত হয়েছে। আমার ফল জেনে আপনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন। আমি A^+ পেয়েছি। দোয়া করবেন, আমি যেন ভবিষ্যতে আপনার মুখ উজ্জ্বল করতে পারি।

আপনাকে অনেক দিন দেখিনি। আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। ছুটি নিয়ে এক দিনের জন্য হলেও আমাদের সঙ্গে দেখা করে যান। আমরা আপনার অপেৰায় রইলাম।

বাড়ির সবাই ভালো আছে। আপনি শরীরের প্রতি যত্ন নেবেন। ভালো থাকবেন।

ইতি
আপনার স্নেহের
কাজল।

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

৬. মনে করো, তোমার নাম খসরব। তোমার বড় বোনের বিয়ের দিন ঠিক করা হয়েছে। তোমার প্রিয় বন্ধু হামিদকে এ উপলৰে একটি চিঠি লেখো।

পূর্ব ঘোপাল, ফেনী
২৫শে মার্চ, ২০১৬

প্রিয় হামিদ,

শুভেচ্ছা নিও। আশা করি ভালো আছ। আগামী ১০ই এপ্রিল আমার বড় আপার বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। তুমি অবশ্যই আসবে। মা, আপা সবাই তোমাকে আসতে বলেছেন। তুমি কিন্তু ৭ তারিখের মধ্যেই চলে আসবে, কেমন? অনেক কাজ করতে হবে। আমাদের সব বন্ধুরাই আসছে। খুব মজা হবে।

আজকের মতো বিদায়। সাবধানে এসো।

ইতি
তোমার বন্ধু
খসরব

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

৭. মনে করো, তুমি ফরহাদ। গ্রীষ্মের ছুটি কীভাবে কাটাবে তা জানিয়ে তোমার বন্ধু শফিককে একটি চিঠি লেখো।

বয়রা, খুলনা
১০/০৪/২০১৬

প্রিয় শফিক,

ভালোবাসা নিও। তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দিত হয়েছি।

তোমাকে একটা খুশির খবর দিই, এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে আমাদের বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটি শুরব হবে। এবারের ছুটিতে মা-বাবার সাথে আমি সোনারগাঁও ও পাহাড়পুর যাব। এ দুটিই আমাদের দেশের অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান। স্থানগুলোতে গেলে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যাবে। তুমিও চলো না আমাদের সাথে। খুব মজা হবে।

ভালো থেকো। তোমার মতামত জানিও।

ইতি
তোমার শুভার্থী
ফরহাদ

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

৮. মনে করো, তোমার নাম অহনা/অহন। তোমার কলকাতা প্রবাসী এক বন্ধুর নাম বাদল/বৃষ্টি। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে তুমি যা জান তা তোমার বন্ধুকে জানিয়ে একটি চিঠি লেখো। ধরো, তোমার বন্ধুকে লেখার ঠিকানা– ৩৬, সল্ট লেক, কলকাতা, ভারত।

মহিষাকান্দি, নরসিংদী।
২২শে ফেব্রবয়ারি, ২০১৬

প্রিয় বাদল,

কেমন আছ? আমি ভালোই আছি। কাল ছিল আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আজ তোমাকে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জানিয়ে লিখছি।

১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ঘোষণা দেন যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এর প্রতিবাদে ফেটে পড়ে বাংলার ছাত্র সমাজ। ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সংস্কৃতিক সংগঠনগুলো রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে ২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা থেকে ঢাকায় ১৪৪ দ্বারা জারি করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারির দিন স্লোগানে স্লোগানে রাজপথ উত্তাল হয়ে ওঠে। সরকারের জারি করা ১৪৪ ধারার পরোয়া না করেই এগিয়ে গেল ছাত্র-জনতা। পুলিশের গুলিতে রফিক, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে শহিদ হলেন। এ ঘটনা সারা দেশের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তুলল। রাস্তায় নেমে এলো লাখো জনতা। অবশেষে ভাষাশহিদদের জীবনের বিনিময়ে আমরা পেলাম মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলার অধিকার।

তোমার বাবা-মাকে আমার সালাম জানিও। আজ বিদায় নিচ্ছি।

ইতি
তোমার বন্ধু
অহনা

BY AIR MAIL STAMP

From
Badal
Mohishalkandi,
Narsinghdi,
BANGLADESH.

To,
Ahona
36, Salt lake,
Calcutta,
INDIA.

৯. মনে করো, তোমার নাম বিকাশ/বৈশাখী। তোমার বন্ধুর নাম রহিম/শশী। তোমার প্রিয় বই সম্পর্কে জানিয়ে বন্ধুর কাছে একটি পত্র লেখো।

উত্তরা, ঢাকা।
১৮/০৭/২০১৬

প্রিয় শশী,

কেমন আছ? আমি ভালো আছি। আজ আমি তোমাকে আমার প্রিয় বইয়ের কথা জানাব।

আমার সবচেয়ে প্রিয় বই হচ্ছে 'কাকের নাম সাবানি'। বইটির লেখক আনিসুল হক। সাবানি নামের একটি কাকের মজার সব কান্ড নিয়ে বইটি লেখা হয়েছে। সাবানির খুব ইচ্ছা সে শিল্পী হবে। যে উদ্দেশ্যে সে ঢাকার দিকে রওনা দেয়। তারপর কত রকমের অভিজ্ঞতা যে তার হয়! সেগুলো পড়ে কখনও হেসে উঠি। কখনো আবার মন খারাপ হয়ে যায়। একবার বইটা নিয়ে বসলে শেষ না করে ওঠার উপায় নেই। আর বইটাতে আছে শেখার মতন অনেক কিছু।

আজ এখানেই শেষ করছি। নতুন কী বই পড়লে জানিও।

ইতি
তোমার বন্ধু
বৈশাখী

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

১০. মনে করো, তোমার নাম পলরব/পলি। জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসার কথা জানিয়ে তোমার আমেরিকা প্রবাসী বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো। ধরো, তোমার বন্ধুর নাম ড্যানিয়েল/ডোরি। তার ঠিকানা– ২৪ ডাউনিং স্ট্রীট, নিউইয়র্ক, আমেরিকা।

বাঘা, রাজশাহী
১২/০৪/২০১৬

প্রিয় ড্যানিয়েল,

কেমন আছ বন্ধু? গত চিঠিতে তুমি জন্মভূমি সম্পর্কে আমার অনুভূতির কথা জানতে চেয়েছ। আজ সে কথা জানিয়ে তোমাকে লিখছি।

আমাদের দেশটা অনেক সুন্দর। মন ভোলানো এর প্রকৃতি। সারা দেশে সবুজের ছড়াছড়ি। নদী, পাহাড়, সমুদ্র সবই আছে এদেশে। আর আছে নানা ধর্ম, পেশা ও সংস্কৃতির মানুষ। সকলেই এদেশে মিলেমিশে বসবাস করে। এই সবকিছুই আমাকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। ত্রিশ লক্ষ মানুষ সে যুদ্ধে শহিদ হয়েছে। এদেশকে নিয়ে তাই আমাদের অহংকারের শেষ নেই। বাংলাদেশে জন্ম নিতে পেরে আমি গর্বিত। দেশকে আমি আমার মায়ের মতোই ভালোবাসি।

আজ আর নয়। তোমার দেশের কথা জানিয়ে আমাকে চিঠি দিও।

ইতি
তোমার বন্ধু
পলরব

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

১১. মনে করো, তোমার নাম সাকিব/সালমা। তোমার বন্ধুর নাম অয়ন/আয়না। সম্প্রতি তুমি একটি স্থান থেকে বেড়িয়ে এসেছ। সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি পত্র লেখো।

মালিবাগ, ঢাকা।
১৭/০২/২০১৬

প্রিয় অয়ন,

শুভেচ্ছা নিও। আশা করি ভালো আছ।

গত সপ্তাহে বাবা-মা'র সাথে সেন্টমার্টিন থেকে ঘুরে এসেছি। দারুন মজা হয়েছে। ঢাকা থেকে ট্রেনে চড়ে প্রথমে গিয়েছি চট্টগ্রাম। সেখান থেকে বাসে করে টেকনাফ। তারপর জাহাজে সেন্টমার্টিন পৌঁছেছি। সেন্টমার্টিনের সৌন্দর্য বলে বোঝানোর মতো না। সাগরের স্বচ্ছ নীল পানি, রাতের আকাশে হাজার তারার মেলা, সৈকতে ঘুরে বেড়ানো নানা রঙের কাঁকড়া, সূর্যোদয়ের দৃশ্য ইত্যাদি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছি। অনেক রকমের সামুদ্রিক মাছের স্বাদ নিয়েছি। আর খেয়েছি সেন্টমার্টিনের সুমিষ্ট ডাবের পানি। সেন্টমার্টিনের অদূরেই আছে ছেঁড়াদ্বীপ। নৌকায় চড়ে সেখানেও গিয়েছি। সেন্টমার্টিনে আমরা দুই দিন ছিলাম। ফেরার পথে টেকনাফ এসে বাসে চড়ে সরাসরি ঢাকায় ফিরেছি। সব মিলিয়ে সেন্টমার্টিন ভ্রমণের স্মৃতি ভোলার মতো নয়।

আজ বিদায় নিচ্ছি। তোমার ময়না পাখিটার কী খবর? ভালো থেকো।

ইতি
তোমার বন্ধু
সাকিব

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

১২. মনে করো, তোমার নাম হাসনা/সেলিম। তোমার ছোট ভাইয়ের নাম আকাশ। স্বাধীনতা দিবস কীভাবে উদ্‌যাপন করেছ সে সম্পর্কে জানিয়ে তাকে একটি পত্র লেখো।

সাভার, ঢাকা।
২৯/০৩/২০১৬

আদরের আকাশ,

কেমন আছ? বাড়ির সবাই ভালো তো? তোমার বিড়ালটা কত বড় হলো?

২৬ তারিখ ছিল আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। নানা রকম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের সবাই মিলে এ দিবসটি উদ্‌যাপন করেছি। দিনটি উপলক্ষে আমরা পুরো বিদ্যালয় কাগজের পতাকা দিয়ে সাজিয়েছিলাম। দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল। সকাল বেলা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে। সেখানে আমরা ফুল দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। দুপুর থেকে বিদ্যালয়ে আরম্ভ হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তি, গান, নাচ, ছোট নাটিকা ইত্যাদি উপস্থাপন করে। আমিও একটি কবিতা আবৃত্তি করি। বিকেলে অডিটোরিয়ামের বড় পর্দায় দেখানো হয় 'আমার বন্ধু রাশেদ' চলচ্চিত্রটি। দেখে খুব ভালো লাগল। সব মিলিয়ে খুব আনন্দময় একটি দিন কেটেছে।

আজ আর নয়, গরমের ছুটিতে বাড়ি আসছি।

ইতি
তোমার বড় বোন
হাসনা

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

১৩. মনে করো, তোমার নাম মানিক। তোমার বন্ধুর নাম রিয়াজ। সম্প্রতি তোমার এলাকায় ঘটে যাওয়া একটি সড়ক দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখো।

যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
১৪ই মার্চ, ২০১৬

প্রিয় রিয়াজ,

শুভেচ্ছা নিও। কেমন আছ? কয়েকদিন আগে আমার চোখের সামনে একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। সেই দুঃসহ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে তোমাকে লিখছি।

তখন বিকেল প্রায় চারটা। স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরছি। একটি অল্পবয়সী ছেলে রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছিল। কাছেই ফুট-ওভারব্রিজ থাকলেও ছেলেটি তা ব্যবহার করছিল না। হঠাৎ তাড়াহুড়ায় রাস্তা পার হওয়ার সময় উল্টোদিক থেকে একটি বাস এসে তাকে চাপা দিয়ে চলে গেল। ঘটনাস্থলেই ছেলেটির মৃত্যু হলো। রক্তে রাজপথ ভেসে যাচ্ছিল। ছেলেটিকে দেখে চেনার কোনো উপায় ছিল না। চোখের সামনে এমন দৃশ্য দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। দ্রুত বাড়ি ফিরে এলাম।

ভালো থেকো। রাস্তা পারাপারে সব সময় সাবধান থাকবে। চাচা-চাচিকে আমার সালাম জানিও।

ইতি
তোমার বন্ধু
মানিক

[ঠিকানাসহ খাম হবে]

❑ আবেদন পত্র :

[পাঠ্য বই থেকে]

১. মনে করো তোমার নাম প্রত্যয়। অষ্টম শ্রেণিতে তোমার রোল নম্বর ০১। হঠাৎ করে তোমার বাবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে তোমার লেখাপড়া বন্ধ হতে বসেছে। এ অবস্থায় বিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে সাহায্য চেয়ে প্রধান শিক্ষকের নিকট একখানি আবেদন পত্র লেখো।

১৮/০৭/২০১৬

বরাবর,
প্রধান শিক্ষক,
শ্রীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা।

বিষয় : বিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই, আমি আপনার বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির একজন নিয়মিত ছাত্র। বিগত তিন বছর যাবৎ আমি এ বিদ্যাপীঠে পড়ালেখা করছি। পরীক্ষায় সব সময়ই আমি প্রথম হয়ে এক শ্রেণি থেকে অন্য শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছি। অষ্টম শ্রেণিতেও আমার রোল নম্বর ০১। আমার বাবা একজন দরিদ্র কৃষক। পরিবারের ভরণপোষণ ছাড়াও আমাদের তিন ভাইবোনের লেখাপড়ার খরচ চালাতে তিনি হিমশিম খান। তবুও তিনি এ যাবৎ বিদ্যালয়ের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করে আমাদের পড়ালেখার খরচ চালিয়ে আসছিলেন। সম্প্রতি তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। এমতাবস্থায় বিদ্যালয়ের ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করে আমার লেখাপড়া চালিয়ে যাবার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

অতএব মহোদয়, আমার আবেদন মানবিকভাবে বিবেচনা করে আমাকে ছাত্রকল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্যদানে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক
প্রত্যয়
রোল নং– ০১, অষ্টম শ্রেণি
শ্রীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা।

২. শিক্ষাসফরের গুরুত্ব উল্লেখ করে তোমার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট শিক্ষাসফরে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে একটি আবেদন পত্র লেখো।

বরাবর,
প্রধান শিক্ষক,
সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমি, শেরপুর।

বিষয় : শিক্ষাসফরে প্রেরণের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা আপনার বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী। প্রতি বছর এই বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিক্ষাসফরে গিয়ে থাকে। কিন্তু এবছর এখনো তার কোনো উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। আমরা শিক্ষাসফরে যেতে চাই। ছাত্রজীবনে শিক্ষাসফরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

শিৰাসফরের ফলে ব্যবহারিক শিৰার সঙ্গে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আরো সমৃদ্ধ হয়। যেকোনো ভ্রমণেই দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোভাবে জানার সুযোগ হয়।

আমরা এবার শিৰাসফরে ময়মনসিংহে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করছি। ময়মনসিংহ প্রাচীন শহর। এর মুক্তাগাছা থানা শিৰা-সংস্কৃতিতে খুব অগ্রগামী ছিল। সেখানে প্রাচীন জমিদার বাড়ি আছে। ময়মনসিংহ শহরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছিলেন। সে স্মৃতিচিহ্নও দেখা যাবে। তাছাড়া কৃষি বিশ্ববিদ্যায়, আনন্দমোহন কলেজ, জয়নুল আবেদীন সংগ্রহশালা ইত্যাদিও আমাদের আগ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে। এসব স্থান ও স্থাপনা দর্শন করে আমরা বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে সৰম হব।

একদিনের এই সফরের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আমরা বহন করব। আমাদের সঙ্গে দুজন সিনিয়র শিৰক যেতে রাজি হয়েছেন। আপনার সম্মতি পেলে শিৰাসফরে যাওয়ার দিন ধার্য করে আমরা আমাদের অভিভাবকদের অনুমতি গ্রহণ করব।

অতএব, মহোদয়ের কাছে বিনীত আবেদন, আমাদের শিৰাসফরে যাওয়ার সদয় অনুমতি দিয়ে এবং ময়মনসিংহে সংশিরষ্ট কর্তৃপৰের সহযোগিতা লাভের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন।

বিনীত–
অষ্টম শ্রেণির শিৰার্থীদের পৰে
সাইফুল ইসলাম
সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমি, শেরপুর।
তারিখ : ১১. ০৮. ২০১৬

৩. মনে করো, তোমার বাবা একটি ব্যাংকে চাকরি করেন। সম্প্রতি তোমার বাবার বদলি হয়েছে। তাই তোমাকেও তাঁর সাথে চলে যেতে হবে। এজন্য তোমার স্কুলের প্রধান শিৰকের কাছে ছাড়পত্র চেয়ে আবেদন করো।

বরাবর,
প্রধান শিৰক,
রাঙামাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
রাঙামাটি।

বিষয় : বিদ্যালয় থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য আবেদন।

মহোদয়,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির একজন ছাত্র। আমার বাবা একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। সম্প্রতি তাঁকে কক্সবাজার জেলা শহরে বদলি করা হয়েছে। তাই পরিবারের সবার সঙ্গে আমাকেও কক্সবাজার যেতে হচ্ছে। সেখানে নতুন করে ভর্তির জন্য এই বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র প্রয়োজন।

অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বিদ্যালয় ত্যাগের ছাড়পত্র দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক,
তাহসিন আহমেদ
রোল নং – ১২, ৮ম শ্রেণি
রাঙামাটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রাঙামাটি।
তারিখ : ১৪. ০৬. ২০১৬

৪. ধরো, তুমি এ.কে. উচ্চ বিদ্যালয়, দনিয়া, ঢাকার অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। তোমাদের স্কুলে একটি 'বিজ্ঞান ক্লাব' গঠনের অনুমতি চেয়ে প্রধান শিৰকের নিকট একখানা আবেদন পত্র রচনা করো।

১৮/০৭/২০১৬

বরাবর,
প্রধান শিৰক,
এ.কে. উচ্চ বিদ্যালয়, দনিয়া, ঢাকা।

বিষয় : 'বিজ্ঞান ক্লাব' গঠনের অনুমতির জন্য আবেদন।

মহোদয়,
সবিনয় নিবেদন এই যে, আমরা আপনার বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রী। বেশ কিছুদিন থেকে আমরা স্কুলে বিজ্ঞানচর্চার জন্য একটি বিজ্ঞান ক্লাবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই চরম উৎকর্ষের যুগে বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া শিৰা সম্পূর্ণ হয় না। আর বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করা হলে বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা, তথ্য আদান-প্রদান, পত্র–পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হবে। বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করে আমরা নতুন নতুন বিজ্ঞান প্রজেক্ট তৈরিতেও দ্রুত সফলতা অর্জন করব।

অতএব, মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা, আমাদের বিদ্যালয়ে একটি 'বিজ্ঞান ক্লাব' গঠনের অনুমতি ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে বাধিত করবেন।

নিবেদক–
অষ্টম শ্রেণির শিৰার্থীদের পৰে
আবদুস সালাম
এ.কে. উচ্চ বিদ্যালয়, দনিয়া, ঢাকা।

[অতিরিক্ত অংশ]

৫. মনে করো, তোমার নাম সেলিম চৌধুরী। তোমার বিদ্যালয়ের নাম জয়পুর সরোজিনী উচ্চ বিদ্যালয়। অসুস্থতার জন্য তুমি তিন দিন বিদ্যালয়ে যেতে পারনি। অনুপস্থিতির ছুটি মঞ্জুরের জন্য প্রধান শিৰকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখো।

২৪/০৪/২০১৬

বরাবর
প্রধান শিৰক
জয়পুর সরোজিনী উচ্চ বিদ্যালয়
ছাগলনাইয়া, ফেনী।

বিষয় : অনুপস্থিতির ছুটি মঞ্জুরের জন্য আবেদন।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কারণে আমি গত ২১/০৪/২০১৬ থেকে ২৩/০৪/২০১৬ এ তিন দিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারিনি।

অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে উক্ত তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক
আপনার একান্ত অনুগত ছাত্র
সেলিম চৌধুরী
শ্রেণি– ৮ম, রোল– ৭

৬. মনে করো, তুমি রোকাইয়া শশী। আগামী ২৫শে জুন তোমার বড় বোনের বিয়ে। এ উপলৰে্য চার দিনের অগ্রিম ছুটি চেয়ে তোমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিৰকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখো।

২১/০৬/২০১৬

বরাবর
প্রধান শিৰক
ছয়সূতী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
কুলিয়ারচর, কিশোরগঞ্জ।

বিষয় : অগ্রিম ছুটির জন্য আবেদন।

মহোদয়,
সবিনয় নিবেদন এই যে, আগামী ২৫শে জুন আমার বড় বোনের শুভ বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমাকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। তাই আমার ২২শে জুন থেকে ২৫শে জুন পর্যন্ত মোট ৪ দিনের ছুটি অত্যন্ত প্রয়োজন।

অতএব, অনুগ্রহপূর্বক আমাকে উক্ত ৪ দিনের ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

নিবেদক
আপনার অনুগত ছাত্রী
রোকাইয়া শশী
৮ম শ্রেণি, শাখা–ক
রোল–০১

৭. **মনে করো, তোমার নাম সিরাজ আহমেদ। তোমার বিদ্যালয়ের নাম গাজীরখামার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ চেয়ে প্রধান শিৰকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখো।**

০২/ ০৩/২০১৬
বরাবর
প্রধান শিৰক
গাজীরখামার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
গাজীরখামার, শেরপুর।

বিষয় : বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য আবেদন।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির 'খ' শাখার একজন নিয়মিত ছাত্র। প্রথম শ্রেণি হতেই আমি আমি আপনার বিদ্যালয়ে পড়ছি এবং বরাবরই প্রথম হয়ে আসছি। আমার ছোট বোনও এই বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে। আমার বাবা একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। বাবার সামান্য আয়ে আমাদের যাবতীয় খরচ চালানো খুবই কষ্টকর। এ অবস্থায় তাঁর পৰে আমাদের দুই ভাইবোনের লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

অতএব, বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমাকে আপনার বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করার সুযোগ দিয়ে বাধিত করবেন।

বিনীত নিবেদক
সিরাজ আহমেদ
৮ম শ্রেণি, শাখা–খ
রোল–০১

৮. **মনে করো, তুমি মুহম্মদনগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ছাত্র। বিদ্যালয়ে আসার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছ। এ অবস্থায় তৃতীয় ঘণ্টার পর ছুটি চেয়ে প্রধান শিৰকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখ। তোমার নাম মো. হাসান।**

১৭/০৫/২০১৬
বরাবর
প্রধান শিৰক
মুহম্মদনগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়
মুহম্মদনগর, সিলেট।

বিষয় : তৃতীয় ঘণ্টার পর ছুটির জন্য আবেদন।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আজ বিদ্যালয়ে আসার পর থেকে আমার প্রচন্ড পেটব্যথা হচ্ছে। এ কারণে আমি ক্লাসগুলোতে মনোযোগ দিতে পারছি না।

অতএব, দয়া করে আমাকে তৃতীয় ঘণ্টার পর ছুটি দিয়ে বাধিত করবেন।

বিনীত
মো. হাসান
৮ম শ্রেণি, শাখা– ক
রোল–১০

৯. **মনে করো, তোমার নাম আবেদ মেহেদী। জরুরি প্রয়োজনে গত মাসে তোমার বাবা খুলনা গিয়েছিলেন। যে কারণে তুমি যথাসময়ে বেতন ও পরীৰার ফি পরিশোধ করতে পার নি। এ অবস্থায় বিলম্বে বেতন ও ফি প্রদানের ৰেত্রে জরিমানা মওকুফের জন্য প্রধান শিৰকের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখো।**

০৯/০৮/২০১৬
বরাবর
প্রধান শিৰক
মাছিমপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়
বাগহাটা, নরসিংদী।

বিষয় : জরিমানা মওকুফের জন্য আবেদন।

জনাব,
বিনীত নিবেদন এই যে, আমার বাবা জরুরি প্রয়োজনে গত মাসে খুলনা গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরতে তাঁর প্রায় এক সপ্তাহ সময় লেগেছিল। যে কারণে আমি যথাসময়ে বিদ্যালয়ের মাসিক বেতন ও দ্বিতীয় সাময়িক পরীৰার ফি পরিশোধ করতে পারিনি।

অতএব, বিনীত আবেদন, জরিমানা মওকুফ করে আমাকে বকেয়া বেতন ও ফি পরিশোধের সুযোগ দিতে আপনার মর্জি হয়।

বিনীত
আবেদ মেহেদী
৮ম শ্রেণি
শাখা–ক
রোল–০৬

১০. **মনে করো, তোমার নাম আবীর রায়হান। তুমি অষ্টম শ্রেণিতে পড়। বিদ্যালয়ে একটি নলকূপ স্থাপনের আবেদন জানিয়ে প্রধান শিৰক বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখো।**

তারিখ : ১৪/০৬/২০১৬
বরাবর
প্রধান শিক্ষক
আলমনগর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
আলমনগর, নাটোর।

বিষয় : নলকূপ স্থাপনের জন্য আবেদন।

জনাব,

বিনয়ের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের বিদ্যালয়ে প্রায় ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। অথচ বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোনো ব্যবস্থা নেই। একমাত্র নলকূপটিও অনেক দিন থেকে নষ্ট। অনেকেই বাধ্য হয়ে কলের অনিরাপদ জল পান করছে। এর ফলে তারা ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েডসহ নানা রকম অসুখে আক্রান্ত হচ্ছে। তাই বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

অতএব, বিনীত নিবেদন, বিদ্যালয়ে অতি শিগ্রই অন্তত একটি নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা করে আমাদের বাধিত করবেন।

নিবেদক
বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে
আবীর রায়হান
অষ্টম শ্রেণি
রোল নম্বর– ৭

১১. মনে করো, তোমার নাম ইকবাল হাসান। ফুটবল খেলা দেখার জন্য ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষক বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখো।

তারিখ : ১২ই মার্চ, ২০১৬

বরাবর,
প্রধান শিক্ষক
গাইবান্ধা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
লালবাগ, ঢাকা।

বিষয় : ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়ার জন্য সাময়িক ছুটির আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আগামীকাল সুজানগর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে স্বাধীনতা দিবস ফুটবল কাপের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। খেলাটিতে আমাদের স্কুল সুজানগর উচ্চ বিদ্যালয়ের মুখোমুখি হবে। আমরা সবাই খেলাটি দেখতে অত্যন্ত আগ্রহী।

অতএব, বিনীত প্রার্থনা, আগামীকাল দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ পিরিয়ড পর্যন্ত ক্লাস বন্ধ রেখে আমাদের খেলাটি দেখার সুযোগ দিয়ে বাধিত করবেন।

নিবেদক
বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে
ইকবাল হাসান
শ্রেণি : ৮ম; শাখা– ক
রোল নং– ০২।

১২. ধরো, তোমার নাম ইশতিয়াক। তোমার এলাকায় পাঠাগার স্থাপনের জন্য উপজেলা চেয়ারম্যানের নিকট আবেদনপত্র লেখো।

বরাবর
উপজেলা চেয়ারম্যান
পলাশবাড়ি উপজেলা পরিষদ
গাইবান্ধা।

বিষয় : পাঠাগার স্থাপনের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সম্মানপূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের পলাশবাড়ি উপজেলাটি একটি জনবহুল এলাকা। হাইস্কুল ও প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ এখানকার জনসংখ্যা প্রায় দুই হাজারের ওপরে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এখানে কোনো পাঠাগার নেই। ছাত্র–ছাত্রীদের জ্ঞানচর্চা, মানসগঠন ও সৃজনশীল চেতনা বিকাশে একটি পাঠাগার খুবই জরুরি। এ ছাড়া এলাকায় দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িক পত্র–পত্রিকা পড়ারও কোনো ব্যবস্থা নেই। এখানে একটি পাঠাগার হলে তরুণরা তাদের অলস সময়কে জ্ঞানচর্চার মতো প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করতে পারবে।

অতএব, পলাশবাড়ি উপজেলার সব বয়সের জনসাধারণের উপকারের কথা বিবেচনা করে অতিসত্বর এখানে একটি পাঠাগার স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিবেদক
পলাশবাড়ি উপজেলার জনসাধারণের পক্ষে
ইশতিয়াক আহমেদ
তারিখ : ২রা জুন ২০১৬।

❑ নিমন্ত্রণ পত্র

[পাঠ্য বই থেকে]

১. তোমার স্কুলে 'নজরুল জন্মজয়ন্তী' উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি আমন্ত্রণ পত্র রচনা করো।

সুধী,

আগামী ১১ই ভাদ্র, ১৪২৩ / ২৯শে আগস্ট, ২০১৬, শনিবার বিকাল চারটায় বিদ্রোহী ও আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শিয়ালি উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন বরেণ্য কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক। সভাপতিত্ব করবেন প্রধান শিক্ষক সরোজ কুমার চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি।

বিনীত–
তারিখ : ২৫.০৮.২০১৬ ফরিদ আহমদ সলিল
আহ্বায়ক
নজরুল জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন পরিষদ
শিয়ালি উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা।

অনুষ্ঠানসূচি

০৪. ০৫ : অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ

০৪. ২০ : পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ
০৪. ৩০ : বিশেষ আলোচনা
০৫. ০০ : সভাপতির ভাষণ
০৫. ৩০ : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

২. তোমার পাড়ায় "আঞ্চলিক মৈত্রী সংঘ" নামে একটি ক্লাব আছে। ক্লাবের পৰ থেকে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলৰে একটি নিমন্ত্রণ পত্র রচনা কর।

প্রিয় সুধী,
শুভ 'নববর্ষ' উদ্‌যাপন উপলৰে আগামী ১লা বৈশাখ, ১৪২৩/১৪ই এপ্রিল, ২০১৬, মঙ্গলবার সকাল ০৭টায় আঞ্চলিক মৈত্রী সংঘের পৰ থেকে এক বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি সবান্ধব আমন্ত্রিত।

বিনীত–
তারিখ : ১০.০৪.২০১৬ অরিন্দম খালেক
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
আঞ্চলিক মৈত্রী সংঘ, সিলেট।

অনুষ্ঠানসূচি
০৬.৩০ : মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতি
০৭.৩০ : সংঘ-প্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রা
০৯.০০ : প্রীতিভোজ
১০.০০ : সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
১২.০০ : সমাপ্তি।

৫. প্রবন্ধ রচনা

- **প্রবন্ধ কী :** কোনো একটি বিষয়কে ভাব ও চিন্তার মধ্য দিয়ে ভাষায় প্রাণবন্ত করে প্রকাশ করাই হচ্ছে প্রবন্ধ।
- **প্রবন্ধের প্রকারভেদ :** বিষয়ভেদে প্রবন্ধকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা– ১. বর্ণনামূলক; ২. ঘটনামূলক; ও ৩. চিন্তামূলক।
- **প্রবন্ধ রচনার ৰেত্রে যা যা প্রয়োজন :** প্রবন্ধ রচনার সময় কিছু নিয়মকানুন অনুসরণ করা প্রয়োজন। তাহলে প্রবন্ধের মান বৃদ্ধি পায় এবং পরীৰায় অধিক নম্বর পাওয়া যায়। এৰেত্রে–
  ১. প্রবন্ধের বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।
  ২. চিন্তাপ্রসূত ভাবগুলো অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে সাজাতে হবে।
  ৩. প্রত্যেকটি ভাব উপস্থাপন করতে হবে পৃথক অনুচ্ছেদে।
  ৪. একই ভাব, তথ্য বা বক্তব্য বারবার উলেৱখ করা যাবে না।
  ৫. রচনার ভাষা হতে হবে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল।
  ৬. উপস্থাপিত তথ্যাবলি অবশ্যই নির্ভুল হতে হবে।
  ৭. বড় ও জটিল বাক্য যতটা সম্ভব পরিহার করতে হবে।
  ৮. নির্ভুল বানানে লিখতে হবে।
  ৯. সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটানো যাবে না।
  ১০. উপসংহারে সুচিন্তিত নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করতে হবে।

[পাঠ্য বই থেকে]

১ বাংলাদেশের ষড়ঋতু

সূচনা : বাংলাদেশ ঋতু-বৈচিত্র্যের দেশ। এখানে এক এক ঋতুর এক এক রূপ। ঋতুতে ঋতুতে এখানে চলে সাজ বদলের পালা। নতুন নতুন রঙ-রেখায় প্রকৃতি আলপনা আঁকে মাটির বুকে, আকাশের গায়ে, মানুষের মনে। তাই ঋতু বদলের সাথে সাথে এখানে জীবনেরও রঙ বদল হয়। সে-কারণেই বুঝি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়–

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে–
তুমি বিচিত্র রূপিণী।

ষড়ঋতুর পরিচয় : পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ঋতুর সংখ্যা চারটি হলেও বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। এখানে প্রতি দুই মাস অন্তর একটি নতুন ঋতুর আবির্ভাব ঘটে। ঋতুগুলো হচ্ছে– গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। এরা চক্রাকারে আবর্তিত হয়। আর প্রত্যেক ঋতুর আবির্ভাবে বাংলাদেশের প্রকৃতির রূপ ও সৌন্দর্য বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে।

গ্রীষ্মকাল : ঋতুচক্রের শুরুতেই আসে গ্রীষ্ম। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ দুই মাস গ্রীষ্মকাল। আগুনের মশাল হাতে মাঠ–ঘাট পোড়াতে পোড়াতে গ্রীষ্মরাজের আগমন। তখন আকাশ-বাতাস ধুলায় ধূসরিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির শ্যামল-স্নিগ্ধ রূপ হারিয়ে যায়। খাল-বিল, নদী-নালা শুকিয়ে যায়। অসহ্য গরমে সমস্ত প্রাণিকুল একটু শীতল পানি ও ছায়ার জন্য কাতর হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে কখনো হঠাৎ শুরু হয় কালবোশেখির দুরন্ত তাণ্ডব। ভেঙেচুরে সবকিছু তছনছ করে দিয়ে যায়। তবে গ্রীষ্ম শুধু পোড়ায় না, অকৃপণ হাতে দান করে আম, জাম, জামরুল, লিচু, তরমুজ ও নারকেলের মতো অমৃত ফল।

বর্ষাকাল : গ্রীষ্মের পরেই মহাসমারোহে বর্ষা আসে। আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল। দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার বেশে বর্ষার আবির্ভাব। মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জনে প্রকৃতি থেমে থেমে শিউরে ওঠে। শুরু হয় মুষলধারায় বৃষ্টি। মাঠ-ঘাট পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। প্রকৃতিতে

দেখা দেয় মনোরম সজীবতা। জনজীবনে ফিরে আসে প্রশান্তি। কৃষকেরা জমিতে ধান-পাটের বীজ রোপণ করে। গাছে গাছে ফোটে কদম, কেয়া, জুঁই। বর্ষায় পাওয়া যায় আনারস, পেয়ারা প্রভৃতি ফল।

শরৎকাল : বাতাসে শিউলি ফুলের সুবাস ছড়িয়ে আসে শরৎ। ভাদ্র–আশ্বিন দুই মাস শরৎকাল। এ সময় বর্ষার কালো মেঘ সাদা হয়ে স্বচ্ছ নীল আকাশে তুলোর মতো ভেসে বেড়ায়। নদীর তীরে তীরে বসে সাদা কাশফুলের মেলা। বিকেল বেলা মালা গেঁথে উড়ে চলে সাদা বকের সারি। সবুজ ঢেউয়ের দোলায় দুলে ওঠে ধানের খেত। রাতের আকাশে জ্বলজ্বল করে অজস্র তারার মেলা। শাপলার হাসিতে বিলের জল ঝলমল ঝলমল করে ।

তাই তো কবি গেয়েছেন–
আজিকে তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।
শরতের এই অপরূপ রূপের জন্যই শরৎকে বলা হয় ঋতুর রানি।

হেমন্তকাল : ঘরে ঘরে নবান্নের উৎসবের আনন্দ নিয়ে আগমন ঘটে হেমন্তের। কার্তিক–অগ্রহায়ণ দুই মাস হেমন্তকাল। প্রকৃতিতে হেমন্তের রূপ হলুদ। সর্ষে ফুলে ছেয়ে যায় মাঠের বুক। মাঠে মাঠে পাকা ধান। কৃষক ব্যস্ত হয়ে পড়ে ফসল কাটার কাজে। সোনালি ধানে কৃষকের গোলা ভরে ওঠে, মুখে ফোটে আনন্দের হাসি। শুরু হয় নবান্নের উৎসব। হেমন্ত আসে নীরবে; আবার শীতের কুয়াশার আড়ালে গোপনে হারিয়ে যায়।

শীতকাল : কুয়াশার মলিন চাদর গায়ে উত্তুরে হাওয়া সাথে নিয়ে আসে শীত। পৌষ–মাঘ দুই মাস শীতকাল। শীত রিক্ততার ঋতু। কনকনে শীতের দাপটে মানুষ ও প্রকৃতি অসহায় হয়ে পড়ে। তবে রকমারি শাক–সবজি, ফল ও ফুলের সমারোহে বিষণ্ন প্রকৃতি ভরে ওঠে। বাতাসে ভাসে খেজুর রসের ঘ্রাণ। ক্ষীর, পায়েস আর পিঠাপুলির উৎসবে মাতোয়ারা হয় গ্রামবাংলা।

বসন্তকাল : সবশেষে বসন্ত আসে রাজবেশে। ফাল্গুন-চৈত্র দুই মাস বসন্তকাল। বসন্ত নিয়ে আসে সবুজের সমারোহ। বাতাসে মৌ মৌ ফুলের সুবাস। গাছে গাছে কোকিল-পাপিয়ার সুমধুর গান। দখিনা বাতাস বুলিয়ে দেয় শীতল পরশ। মানুষের প্রাণে বেজে ওঠে মিলনের সুর। আনন্দে আত্মহারা কবি গেয়ে ওঠেন–

আহা আজি এ বসন্তে
এত ফুল ফোটে, এত বাঁশি বাজে
এত পাখি গায়।
ঋতুরাজ বসন্ত সবার খুব প্রিয় ঋতু।

উপসংহার : বাংলাদেশে ষড়ঋতুর এই লীলা অবিরাম চলছে। বিভিন্ন ঋতু প্রকৃতিতে রূপ-রসের বিভিন্ন সম্ভার নিয়ে আসে। তার প্রভাব পড়ে বাংলার মানুষের মনে। বিচিত্র ষড়ঋতুর প্রভাবেই বাংলাদেশের মানুষের মন উদার ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ।

২ বাংলা নববর্ষ

সূচনা : বাংলা নববর্ষ বাঙালির জীবনে বিশেষ এক তাৎপর্য বহন করে। গতানুগতিক জীবনধারার মধ্যে নববর্ষ নিয়ে আসে নতুন সুর, নতুন উদ্দীপনা। বিগত বছরের সব দুঃখ-বেদনাকে একরাশ হাসি, আনন্দ আর গান দিয়ে ভুলিয়ে দিয়ে যায় নববর্ষ। প্রাচীনকাল থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এটি বাঙালির আনন্দময় উৎসব হিসেবে সুপরিচিত। বাংলা নববর্ষ তাই বাঙালির জাতীয় উৎসব।

বঙ্গাব্দ বা বাংলা সনের ইতিহাস : বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন প্রচলনের ইতিহাস রহস্যে ঘেরা। কোনো কোনো ইতিহাসবিদ মনে করেন, বাংলার সুলতান হোসেন শাহ বাংলা সনের প্রবর্তক। কারো কারো মতে, দিল্লির সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রচলন করেন। তাঁর নির্দেশে আমির ফতেউল্লাহ সিরাজি পূর্বে প্রচলিত হিজরি ও চান্দ্র বছরের সমন্বয়ে সৌর বছরের প্রচলন করেন। তবে সুলতান হোসেন শাহের সময়ে (৯০৩ হিজরি) বাংলা সনের প্রচলন হলেও সম্রাট আকবরের সময় (৯৬৩ হিজরি) থেকেই এটি সর্বভারতীয় রূপ লাভ করে। তখন থেকেই এটি বাঙালি সংস্কৃতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বাংলা সন আপামর বাঙালি জাতির একান্ত নিজস্ব অব্দ।

নববর্ষের উৎসব : বাঙালিরা প্রাচীনকাল থেকেই নববর্ষ উদ্‌যাপন করে আসছে। তখন বছর শুরু হতো অগ্রহায়ণ মাস থেকে। এটি ছিল ফসল কাটার সময়। সরকারি রাজস্ব ও ঋণ আদায়ের এটিই ছিল যথার্থ সময়। পরে বঙ্গাব্দ বা বাংলা সনের প্রচলন হলে বৈশাখ মাস থেকে বর্ষ গণনা শুরু হয়। আর বাঙালিরা পহেলা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করে। বাংলাদেশে নববর্ষ উদ্‌যাপনে এসেছে নতুন মাত্রা। বর্তমানে আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে নববর্ষ পালন করা হয়।

পহেলা বৈশাখ : বিগত দিনের সমস্ত গ্লানি মুছে দিয়ে, পাওয়া না পাওয়ার সব হিসেব চুকিয়ে প্রতি বছর আসে পহেলা বৈশাখ। বাংলা নববর্ষ। মহাধুমধামে শুরু হয় বর্ষবরণ। সবাই গেয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের এই গান :

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ,
তাপ নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা– দূর হয়ে যাক।

বাংলা নববর্ষের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে পহেলা বৈশাখে অনুষ্ঠিত বৈশাখী মেলা। বৈশাখী মেলাই হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সার্বজনীন উৎসব। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের মহামিলন ক্ষেত্র এই মেলা। এ মেলায় আবহমান গ্রাম-বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের একটি পরিচিতি ফুটে ওঠে। বাউল, মারফতি, মুর্শিদি, ভাটিয়ালিসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগানে মেলার আকাশ–বাতাস মুখরিত হয়। যাত্রা, নাটক, পুতুল নাচ, সার্কাস, নাগরদোলা ইত্যাদি মেলায় বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। মেলায় পাওয়া যায় মাটির হাঁড়ি, বাসনকোসন, পুতুল; বেত ও বাঁশের তৈরি গৃহস্থালির সামগ্রী, তালপাখা, কুটির শিল্পজাত বিভিন্ন সামগ্রী, শিশু–কিশোরদের খেলনা, মহিলাদের সাজ–সজ্জা ইত্যাদি। এছাড়া চিঁড়া, মুড়ি, খৈ, বাতাসাসহ নানা রকমের মিষ্টির বৈচিত্র্যময় সমারোহ থাকে বৈশাখী মেলায়। গ্রামের মানুষের বিশ্বাস, পহেলা বৈশাখে ভালো খেলে, নতুন পোশাক পরলে সারাটি বছরই তাদের সুখে কাটবে। তাই গ্রামে পহেলা বৈশাখে পান্তা খায় না। যাদের সামর্থ্য আছে তারা নতুন পোশাক পরে। বাংলা নববর্ষের আরেকটি আকর্ষণ হালখাতা। গ্রামে-গঞ্জে-শহরে ব্যবসায়ীরা নববর্ষের দিন তাদের পুরনো হিসাব-নিকাশ শেষ

করে নতুন খাতা খোলেন। এ উপলৰ্ে তাঁরা নতুন-পুরনো খদ্দেরদের আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি খাওয়ান। প্রাচীনকাল থেকে এখনো এ অনুষ্ঠানটি বেশ জাঁকজমকভাবে পালিত হয়ে আসছে।

নববর্ষের প্রভাব : আমাদের জীবনে নববর্ষ উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে। নববর্ষের দিন ছুটি থাকে। পারিবারিকভাবে বিশেষ খাবারের আয়োজন করা হয়। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। সব কিছুতে আনন্দের ছোঁয়া লাগে। আধুনিক রীতি অনুযায়ী ছোট-বড় সবাই নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড বিনিময় করে। অতীতের লাভ–ৰতি ভুলে গিয়ে এদিন সবাই ভবিষ্যতের সম্ভাবনার স্বপ্ন বোনে। নববর্ষ আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে চলার প্রেরণা যোগায়। তাই আমাদের জীবনে নববর্ষের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক।

নববর্ষের তাৎপর্য : বাঙালির নববর্ষের উৎসব নির্মল আনন্দের উৎসধারা। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এটি আজ আমাদের জাতীয় উৎসব। নববর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে আমরা আমাদের জীবনবাদী ও কল্যাণধর্মী রূপটিই খুঁজে পাই। আমাদের ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে প্রত্যৰ করি। আমাদের নববর্ষ উদ্‌যাপনে আনন্দের বিস্তার আছে, কিন্তু কখনো তা পরিমিতবোধকে ছাড়িয়ে যায় না। বাংলা নববর্ষ তাই বাঙালির সারা বছরের আনন্দের পসরা-বাহক।

উপসংহার : বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনটি আসে সগৌরবে — নিজেকে চিনিয়ে, সবাইকে জানিয়ে। আমাদের জীবনে নবচেতনার সঞ্চার করে, পরিবর্তনের একটা বার্তা নিয়ে আসে নববর্ষ। পুরাতনকে ঝেড়ে ফেলে সে আমাদের জীবনে নতুন হালখাতার প্রবর্তন করে। আমাদের মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে; জাতীয় জীবনে স্বকীয় চেতনা বিকাশে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষে মানুষে গড়ে তোলে সম্প্রীতির কোমল বন্ধন। তাই বাংলা নববর্ষ আমাদের জীবনে এত আনন্দ ও গৌরবের।

৩ ট্রেনে ভ্রমণ

ভূমিকা : ভ্রমণ সর্বদাই আনন্দের। এই আনন্দের সঙ্গে ভ্রমণে যুক্ত হয় জ্ঞানলাভ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।'

প্রকৃতপৰে, ভ্রমণের ফলে মানুষের চিত্ত যেমন প্রফুলৱ হয় ঠিক তেমনি সে অনেক অজানার সন্ধান লাভ করে। আমি একদিন ট্রেন-ভ্রমণে বের হই।

ভ্রমণ কী? : ভ্রমণ হলো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বেড়ানো বা পর্যটন। মহানবীর বাণীতে আছে, জ্ঞানার্জনের লৰ্যে সুদূর চীন দেশে যাবার আহ্বান। শ্রীকৃষ্ণও বিশেষ উদ্দেশ্যে মথুরা থেকে বৃন্দাবনে ভ্রমণ করেছেন। ধর্মীয় মহাপুরুষদের পাশাপাশি বিজ্ঞানীরা চন্দ্রপৃষ্ঠ বা মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করেন। এ সব কিছুর সঙ্গেই আছে আনন্দ আর জ্ঞানের পিপাসা। ভ্রমণ মানবমনে আনন্দ দান করে এবং জ্ঞানের পিপাসা মেটায়। সে কারণে অনেকে এটি কর্তব্যকর্ম বলেও মনে করে।

ভ্রমণের পথসমূহ : সাধারণত স্থলপথ, জলপথ, আকাশপথ এই তিন পথেই ভ্রমণ করা যায়। স্থলপথে বাসভ্রমণ, সাইকেল ভ্রমণ, মোটরসাইকেল ভ্রমণ, টেক্সি ভ্রমণ ইত্যাদি হতে পারে। তবে পরিসর বড়, দীর্ঘ পথ ক্লান্তিহীনভাবে ভ্রমণের পৰে আরামদায়ক রেলভ্রমণ। এতে পথে অনেক স্টেশন থাকায় নানা স্থানের বিচিত্র মানুষের সঙ্গে ৰণিক দেখা হওয়ার সুযোগ ঘটে।

ট্রেনে ভ্রমণের শুরু : পরীৰা শেষে তখন আমার স্কুল বন্ধ। ডিসেম্বর মাসের ৪ তারিখে মা–বাবার সঙ্গে সকাল সাড়ে আটটায় ঢাকার কমলাপুর স্টেশনে গিয়ে পৌঁছি। সঙ্গে আমার বোন মাত্রা। উদ্দেশ্য গ্রামের বাড়ি শেরপুরে যাবো। আমার বাবা আগেই ট্রেনের টিকিট কাটিয়ে রেখেছিলেন। আমরা স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের 'সুলভ' শ্রেণিতে নির্ধারিত আসনে বসলাম। ট্রেনের নাম 'অগ্নিবীণা'। নামটি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার বই থেকে নেওয়া। সকাল ঠিক নয়টায় ট্রেন কমলাপুর স্টেশন ছাড়ল।

ট্রেনের ভেতরের অবস্থা : বাবা আমাকে বলেছিলেন– 'সুলভ' শ্রেণিতে উঠলে বিচিত্র ধরনের মানুষের দেখা মেলে। সত্যি তাই দেখলাম। নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত নানা ধরনের নারী–পুরুষ সেই সঙ্গে শিশুরা আসনে বসেছে। দুজনের আসনে তিন বা চারজনও কষ্ট করে বসে ছিলেন। একজন বৃদ্ধ আসন পাননি। পাশের আসন থেকে একজন যুবক উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বসতে দিলেন। এরই মধ্যে চানাচুরওয়ালা 'চানাচুর–বাদাম' বলে মিহি সুর তুলে, আকর্ষণীয় গন্ধ ছড়িয়ে আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। একজন চোখের সামনে দৈনিক পত্রিকা মেলে ধরে তা পাঠ করায় মনোযোগী ছিলেন। ট্রেন ধীরে ধীরে গতিপ্রাপ্ত হয়।

বিভিন্ন স্টেশন : আমি ইতোমধ্যে জানালার ধারে গিয়ে বসেছি। বোন মাত্রা আমার মুখোমুখি বসে। আমার পাশে বাবা আর মাত্রার পাশে মা বসা। দেখলাম ট্রেন তেজগাঁও, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, জয়দেবপুর ইত্যাদি স্টেশনে ৰাণিক দাঁড়ালো। আর স্টেশনে অপেৰমাণ মানুষগুলো জলদি উঠে পড়লো ট্রেনে। কারো হাতে ছিল ব্যাগ, কারো কোলে শিশু। কিন্তু সবারই একটাই লৰ্য এবং তা হলো ট্রেন। ট্রেনেই উঠেই তাদের সব ব্যস্ততা কমে যায়। যে যার আসন খুঁজে নিয়ে সেখানে বসে যান।

ট্রেন থেকে : জানালার ধারে বসে আছি। মনে হচ্ছে মাঠ–ঘাট–গাছপালা দৌড়াচ্ছে। আমার চক্ষু স্থির। কয়েকটা পাখি আকাশে পাখা মেলে আমাদের পাশাপাশি চলে আবার পিছিয়ে পড়ে। মনে হয়, সারা পৃথিবী যেন ঘুরছে, আর আমরা স্থির আছি। জানালার ধারে বাতাসের গতিবেগের কারণে আমার চুল এলোমেলো হয়ে যায়। পাশে তাকিয়ে দেখি বাবা বই হাতে, মা চোখ বুজে আছেন। ট্রেন থেকে শূন্য মাঠ দেখা যায়। কিছুদিন আগেও এখানে সোনালি ধান ছিল। একটি বাড়ি দ্রুত চলে যায়। সেখানে গরু আর মোষ বাঁধা ছিল। দূরে একটি ইটের বাড়িও চোখে পড়ে। অনেক টিনের ঘরের চালে সূর্য চিক চিক করে। পুকুরে গ্রামের বৌঝিরা কাজে ব্যস্ত–সেটাও চোখে পড়ে। গ্রাম বাংলার রূপ যে এত সুন্দর তা এর আগে আমার চোখে এভাবে আর ধরা পড়েনি। কবি লিখেছেন–

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর–"

জীবনানন্দের এই ভাষ্য যে কতটা সত্য, যেদিন ট্রেনে ভ্রমণ করলাম, সেদিন বুঝতে পারলাম।

উলেৱখযোগ্য স্থান : ট্রেনে ভ্রমণে প্রথমেই উলেৱখযোগ্য স্থান ও স্থাপনার মধ্যে পড়ল কমলাপুর রেলস্টেশন। দীর্ঘতম পস্নাটফর্ম আছে এই স্টেশনে। তারপর তেজগাঁও আসার আগেই দূর থেকে চোখে পড়ে ঢাকার চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বা এফডিসি। ভাওয়ালের জমির ওপর দিয়ে জয়দেবপুরে যাবার আগেই ঢাকা বিমানবন্দর চোখে পড়ে। ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। জামালপুরে যমুনা সার কারখানা ছাড়াও পথে নানা স্থান ও স্থাপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। সাইনবোর্ডগুলোর ওপর একটু স্থির দৃষ্টি রাখলে স্থান ও স্থাপনাগুলার নাম ভালোভাবেই পাঠ করা সম্ভব। ট্রেনে ভ্রমণের সময় নানা স্থান ও বিচিত্র স্থাপনাগুলো আমাকে আকৃস্ট করে।

শেষ স্টেশন : ট্রেন থেকে নামার আগের প্রস্তুতি হিসেবে আমরা সবাই যে যার ব্যাগ হাতে নিলাম। বাবা বড় ব্যাগগুলো এক সঙ্গে রেখে ট্রেন থামার অপেৰা করলেন। আমি আমার একপাটি জুতো খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মাত্রা বললো : শ্রেষ্ঠা দিদি তোমার জুতো আমার সিটের নিচে এসে গেছে। ট্রেন থামতেই লাল শার্ট পরা কুলিরা এলো। বাবা তাদের হাতে ব্যাগ বুঝিয়ে দিলেন। আমরা নামার চেস্টায় ব্যস্ত, অনেকে ট্রেনে উঠার চেস্টায় মত্ত। এ সময় শৃঙ্খলা দরকার। কিন্তু শৃঙ্খলার বড় অভাব। শেষ পর্যন্ত আমরা জামালপুর স্টেশনে নামলাম। আমাদের সাত ঘণ্টার ট্রেনে ভ্রমণ সমাপ্ত হলো।

উপসংহার : ট্রেনে ভ্রমণ না করলে জীবনের বিরাট অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতাম। বিচিত্র মানুষের সঙ্গে পরিচয়, নানা স্থান অবলোকন, বিভিন্ন স্থাপনা দর্শন ইত্যাদি আমার মনে নানা জিজ্ঞাসার জন্ম দেয়। সুন্দর শ্যামল বাংলাদেশ আমার মনে দেশপ্রেম জাগায় আরো তীব্রভাবে। ট্রেনে ভ্রমণের এই সাতটি ঘণ্টা আমার কাছে যেন সাত জনমের অভিজ্ঞতার খন্ডরূপ।

৪ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

সূচনা : মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে যে শোষণ ও অত্যাচারের শুরু হয়েছিল তার অবসান ঘটে এই যুদ্ধের মাধ্যমে। সমগ্র জাতি দেশের মুক্তির জন্য আত্মোৎসর্গের চেতনায় নিজেদের উজাড় করে দিয়েছিল এই যুদ্ধে। ফলে একসাগর রক্তের বিনিময়ে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাঙালি জাতির কাছে স্বর্ণময় এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস–ঐতিহ্যকে সংরৰণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তা জানানোর জন্য সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

জাদুঘরের প্রতিষ্ঠা : ১৯৯৬ সালের ২২শে মার্চ ঢাকাস্থ সেগুনবাগিচার একটি দোতলা ভবনে প্রতিষ্ঠা করা হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। বাংলাদেশের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ–সংক্রান্ত তথ্য, প্রমাণ, বস্তুগত নিদর্শন, রেকর্ডপত্র ও স্মারকচিহ্নসমূহ সংগ্রহ, সংরৰণ ও প্রদর্শনের সুব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে। নিরপেৰ ও বস্তুনিষ্ঠভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাধারা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার প্রয়াসে দেশের কয়েকজন বরেণ্য ব্যক্তি স্ব–উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আলী জাকের, সারা জাকের, আসাদুজ্জামান নূর, জিয়াউদ্দিন তারেক আলী, ডা. সারওয়ার আলী, রবিউল হুসাইন, আক্কু চৌধুরী ও মফিদুল হক। এঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসে অনেক ব্যক্তি বিভিন্ন স্মারক, তথ্য–প্রমাণ ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত হয় একটি ট্রাস্টি বোর্ডের সুদৰ তত্ত্বাবধানে।

জাদুঘরের অবকাঠামো : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রবেশপথের মুখেই রয়েছে ‘শিখা চির অম্লান’। তারকা–আকৃতির একটি বেদির ওপর জ্বলছে অনির্বাণ শিখা। তার পেছনে পাথরে খোদাই করা আছে এক দৃঢ় অঙ্গীকার :

সাৰী বাংলার রক্তভেজা মাটি
সাৰী আকাশের চন্দ্র তারা
ভুলি নাই শহীদদের কোনো স্মৃতি
ভুলব না কিছুই আমরা।

দোতলা বিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মধ্যে রয়েছে ছয়টি গ্যালারি : নিচ তলায় তিনটি ও দোতলায় তিনটি। প্রথম গ্যালারির নিদর্শনগুলো দুটি পর্বে বিন্যস্ত। প্রথম পর্বে প্রদর্শিত হয়েছে বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। যেমন : সিলেট অঞ্চলে প্রাপ্ত ফসিল, পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারের মডেল, ভুটান থেকে পাওয়া শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের মূর্তি, বাগেরহাটের বিখ্যাত ষাটগম্বুজ মসজিদের মডেলসহ বিভিন্ন মসজিদের টালির নিদর্শন এবং মন্দিরের পোড়ামাটির কারুকাজ। এসবের পাশাপাশি এখানে রয়েছে নানা সময়ের মুদ্রা, তালপাতার লিপি ও তুলট কাগজে লেখা মনসামঙ্গল কাব্যের অংশবিশেষ। দ্বিতীয় পর্বে প্রদর্শিত হয়েছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংগ্রামের চিত্র। যেমন : নবাব সিরাজউদ্দৌলা যেখানে পরাজিত হয়েছিলেন সেই পলাশীর আম্রকাননের মডেল; সিরাজউদ্দৌলা, টিপু সুলতান, তিতুমীর, রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিকৃতি; ৰুদিরাম, প্রফুলৱ চাকী, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, মওলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলীর ফটোগ্রাফ। আরো আছে সিপাহি বিদ্রোহের স্থিরচিত্র, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের শহীদদের চিত্র, কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত ‘ধূমকেতু’ পত্রিকার কপি এবং ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিৰের– যাকে আমরা ‘পঞ্চাশের মন্বন্তর’ বলি, তার করুণ দৃশ্যের ছবি।

দ্বিতীয় গ্যালারিতে তুলে ধরা হয়েছে পাকিস্তান আমলের ইতিহাস। ১৯৫২’র ভাষা আন্দোলন, ’৫৪র সাধারণ নির্বাচন, ’৫৮র সামরিক শাসন, ’৬২র সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ’৬৬র ছয় দফার আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ’৬৯–এর গণ–অভ্যুত্থান, ’৭০–এর ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল, ছবি ও স্মারক। তৃতীয় গ্যালারিতে প্রদর্শিত হয়েছে ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন, ২৫শে মার্চ রাত্রিতে সংঘটিত গণহত্যা, স্বাধীনতার ঘোষণা, প্রাথমিক প্রতিরোধ, প্রবাসী সরকার সংক্রান্ত ছবি ও শরণার্থীদের জীবনচিত্র।

দোতলার তিনটি গ্যালারি সাজানো হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন তথ্য, প্রমাণ ও চিত্র দিয়ে। প্রথমটিতে (চতুর্থগ্যালারি) রয়েছে পাকবাহিনীর নিষ্ঠুরতার বিভিন্ন ছবি, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, প্রাথমিক প্রতিরোধ, প্রবাসী সরকার এবং সেক্টর কমান্ডারদের নানা তৎপরতার তথ্য ও ছবি। পরেরটিতে (পঞ্চম গ্যালারি) আছে প্রতিরোধের লড়াই, গেরিলাযুদ্ধ, নৌ–কমান্ডো, বিমানবাহিনী, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, মুক্তিযুদ্ধের পৰে আন্তর্জাতিক

সমর্থন, রাজাকার–দালালদের ভূমিকা এবং সশস্ত্র যুদ্ধের ছবি, স্মারক ও বিবরণ। সবশেষে (ষষ্ঠ গ্যালারি) রয়েছে গণহত্যা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, বীরশ্রেষ্ঠ, শহীদ বুদ্ধিজীবী, চূড়ান্ত লড়াই এবং মুক্তিযুদ্ধের বিজয় সম্পৃক্ত বিভিন্ন স্মারক, বিবরণ ও ছবি।

প্রতিটি গ্যালারিতে আছেন একজন চৌকশ গাইড। তিনি দর্শনার্থীদের নানা প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে তাদের কৌতূহল নিবৃত করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর চত্বরে রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নানারকম বই, পোস্টার, ক্যাসেট, সিডি, স্মারকসামগ্রী বিক্রির জন্য একটি পুস্তকবিপণি, একটি খাবারের দোকান ও একটি উন্মুক্ত মঞ্চ এবং সামনের অংশে আছে ১০০ আসন বিশিষ্ট একটি চমৎকার অডিটোরিয়াম।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কার্যক্রম : মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে দেশের মানুষকে সচেতন করতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। জাদুঘর পরিদর্শনের ৰেত্রে বিদ্যালয়ের ছাত্র– ছাত্রীদের জন্য পরিবহন সুবিধাসহ এখানে নানা সুযোগ–সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রদর্শনীর জন্য একটি গাড়িকে ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অডিটোরিয়ামে ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে আমন্ত্রিত দর্শকদের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়। উন্মুক্ত মঞ্চে আয়োজন করা হয়ে থাকে নানা অনুষ্ঠানের। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংগৃহীত স্মারক সংখ্যা প্রায় এগার হাজার। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিশ্বের আরো আটটি দেশের সমভাবাপন্ন জাদুঘরের সঙ্গে মিলে "ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব হিস্টরিক মিউজিয়ামস্ অব কনসান্স" গঠন করেছে ।

উপসংহার : যে-কোনো জাদুঘর দেশের ইতিহাস–ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জনসমৰে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি-স্মারক-দলিলপত্রের একমাত্র সংগ্রহশালা। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সঠিকভাবে জানতে পারে, ভুলে না যায়, সে লৰ্যেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়ে আসছে।

৫ বাংলাদেশের কৃষক

সূচনা : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ লোক কৃষক। কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ দেশ ভরে ওঠে ফসলের সমারোহে। আমরা পাই ক্ষুধার আহার। কৃষকের উৎপাদিত ফসল বিদেশে রফতানি করে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হয়। বলতে গেলে, কৃষকই আমাদের জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি; আমাদের জাতির প্রাণ। কবির ভাষায় :

সব সাধকের বড় সাধক আমার দেশের চাষা,
দেশ মাতারই মুক্তিকামী, দেশের সে যে আশা।

কৃষকের অতীত ইতিহাস : প্রাচীনকালে এ দেশে জনসংখ্যা ছিল কম, জমি ছিল বেশি। উর্বরা জমিতে প্রচুর ফসল হতো। তখন শতকরা ৮৫ জনই ছিল কৃষক। তাদের গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু আর পুকুর ভরা থাকত মাছে। তাদের জীবন ছিল সুখী ও সমৃদ্ধ। তারপর এলো বর্গীর অত্যাচার, ফিরিঙ্গি–পর্তুগিজ জলদস্যুদের নির্যাতন, ইংরেজদের খাজনা আদায়ের সূর্যাস্ত আইন, শোষণ ও নিপীড়ন। এলো মন্বন্তর, মহামারী। গ্রামবাংলা উজাড় হলো। কৃষক নিঃস্ব হয়ে গেল। সম্পদশালী কৃষক পরিণত হলো ভূমিহীন চাষিতে। দারিদ্র্য তাকে কোণঠাসা করল। কৃষকের জীবন হয়ে উঠল বেদনাদায়ক। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় :

স্কন্ধে যত তার চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতৰণ থাকে প্রাণ তার
তারপর সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি
... শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোন মতে কষ্ট–ক্লিষ্টপ্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।

এভাবেই এককালের সুখী ও সমৃদ্ধ কৃষকের গৌরবময় জীবন–ইতিহাস অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

বর্তমান অবস্থা : বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। কিন্তু বাঙালি কৃষকের উদ্বাস্তু, অসহায় ও বিষণ্ণ জীবনের কোনো রূপান্তর ঘটেনি। বাংলার কৃষক আজো শিৰাহীন, বস্ত্রহীন, চিকিৎসাহীন জীবন–যাপন করছে। দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে, কমেছে কৃষি জমির পরিমাণ। জমির উর্বরতাও গেছে কমে। ফলে বাড়তি মানুষের খাদ্য যোগানোর শক্তি হারিয়েছে এ দেশের কৃষক। পৃথিবী জুড়ে চাষাবাদ পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত দেশ কৃষকের শক্তি বৃদ্ধি করছে। কিন্তু এ দেশে এখনো মান্ধাতার আমলের চাষাবাদ ব্যবস্থা বহাল আছে। বাংলার কৃষকও ভোঁতা লাঙল আর কলজ্কালসার দুটো বলদের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ– কোনো কিছুই মোকাবেলা করার কৌশল ও সামর্থ্য কৃষকের নেই। তবে ধীরে ধীরে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগের গুরুত্ব বাড়ছে। সম্প্রতি ব্যাংক, সমবায় সমিতি বা মহাজনের ঋণের টাকায় আর উচ্চ ফলনশীল বীজের সাহায্যে কৃষিতে ফলন বেড়েছে। কিন্তু ৰেতের ফসল কৃষকের ঘরে ওঠার আগেই ব্যাংক, সমবায় প্রতিষ্ঠান কিংবা মহাজনের ঋণ পরিশোধ করতে হয়। তাই কৃষকের সুখ–স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অবলম্বন হলেও কৃষকের শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন হয় না। এখনো তারা নানা রোগ–শোক, অশিৰা–কুশিৰা, দারিদ্র্য ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

কৃষকের উন্নয়ন : বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। দেশীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদানও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তাই দেশের উন্নয়নের স্বার্থে কৃষকের উন্নয়ন সাধন করা দরকার। বাংলার কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য আজ সবচেয়ে বেশি দরকার চাষাবাদে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন। নিজের জমিতে কৃষক যেন স্বল্পমূল্যে উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক পায় তার ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে কৃষককে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করতে হবে। আবার কৃষক তার ফসলের যেন ন্যায্য দাম পায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকই অশিৰিত। তাদের শিৰিত করে তুলতে হবে। আধুনিক কৃষি-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার জন্য তাকে প্রশিৰণ দিতে হবে। সারা বছর কৃষকের কাজ থাকে না। তাই তার অবসর সময়টুকু অর্থপূর্ণ করার জন্য কুটিরশিল্প সম্পর্কে তাকে আগ্রহী করে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে কৃষকের চিত্তবিনোদন ও রোগ-ব্যাধির চিকিৎসারও সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

উপসংহার : বাংলার কৃষকরাই বাঙালি জাতির মেরুদণ্ড। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি তারা। তবুও কৃষকরা বহুকাল ধরে অবহেলিত। বিশেষ করে তাদের সামাজিক মর্যাদা এখনো নিম্নমানের। এ বিষয়ে আমাদের সকলের সচেতন দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কৃষক ও কৃষিকে গুরুত্ব দিলেই আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল থাকবে। দেশের দারিদ্র্য দূর হবে। বাংলার ঘরে ঘরে ফুটে উঠবে স্বাচ্ছন্দ্যের ছবি। বলা যায়, কৃষকের আত্মার ভেতরই লুকিয়ে আছে আমাদের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের বীজ।

৬ শ্রমের মর্যাদা

সূচনা : কর্মই জীবন। সৃষ্টির সমস্ত প্রাণীকেই নিজ নিজ কাজের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে হয়। ছোট্ট পিঁপড়ে থেকে বিশাল হাতি পর্যন্ত সবাইকেই পরিশ্রম করতে হয়। পরিশ্রম দ্বারাই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে নিজেকে আলাদা করেছে। পরিশ্রমের মাধ্যমেই মানুষ নিজের ভাগ্য বদলেছে। এবং বহু বছরের শ্রম ও সাধনা দ্বারা পৃথিবীকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বলা যায়, মানুষ ও সভ্যতার যাবতীয় অগ্রগতির মূলে রয়েছে পরিশ্রমের অবদান।

শ্রম কী : শ্রমের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মেহনত, দৈহিক খাটুনি। সাধারণত যে–কোনো কাজই হলো শ্রম। পরিশ্রম হচ্ছে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সংগ্রামের প্রধান হাতিয়ার। পরিশ্রমের দ্বারাই গড়ে উঠেছে বিশ্ব ও মানব–সভ্যতার বিজয়–স্তম্ভ।

শ্রমের শ্রেণিবিভাগ : শ্রম দুই প্রকার : মানসিক শ্রম ও শারীরিক শ্রম। শিক্ষক, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক, অফিসের কর্মচারী শ্রেণির মানুষ যে ধরনের শ্রম দিয়ে থাকেন সেটিকে বলে মানসিক শ্রম। আবার কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি, জেলে, মজুর শ্রেণির মানুষের শ্রম হচ্ছে শারীরিক শ্রম। পেশা বা কাজের ধরন অনুসারে এক এক শ্রেণির মানুষের পরিশ্রম এক এক ধরনের হয়। তবে শ্রম শারীরিক বা মানসিক যা–ই হোক না কেন উভয়ের মিলিত পরিশ্রমেই গড়ে উঠেছে মানব–সভ্যতা।

শ্রমের প্রয়োজনীয়তা : মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা। তার এই ভাগ্যকে নির্মাণ করতে হয় কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে। তাই মানবজীবনে পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কর্মবিমুখ অলস মানুষ কোনোদিন উন্নতি লাভ করতে পারে না। পরিশ্রম ছাড়া জীবনের উন্নতি কল্পনামাত্র। জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে নিরলস পরিশ্রম দরকার। পৃথিবীতে যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি তত বেশি উন্নত। তাই ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে মানুষকে পরিশ্রমী হতে হবে। একমাত্র পরিশ্রমই মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে পারে।

শ্রমের মর্যাদা : মানুষের জন্ম স্রষ্টার অধীন, কিন্তু কর্ম মানুষের অধীন। জীবন–ধারণের তাগিদে মানুষ নানা কর্মে নিয়োজিত হয়। কৃষক ফসল ফলায়, তাঁতি কাপড় বোনে, জেলে মাছ ধরে, শিক্ষক ছাত্র পড়ান, ডাক্তার চিকিৎসা করেন, বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন। এঁরা প্রত্যেকেই মানবতার কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। পৃথিবীতে কোনো কাজই ছোট নয়। আর্থ–সামাজিক পদমর্যাদায় হয়তো সবাই সমান নয়। কিন্তু এদের প্রত্যেকেরই মেধা, মনন, ঘাম ও শ্রমে সভ্যতা এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তাই সকলের শ্রমের প্রতিই আমাদের সমান মর্যাদা ও শ্রদ্ধা থাকা উচিত। উন্নত বিশ্বে কোনো কাজকেই তুচ্ছ করা হয় না। সমাজের প্রতিটি লোক নিজের কাজকে গুরুত্ব দিয়ে করার চেষ্টা করে। তাই চীন, জাপান, কোরিয়া, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, কানাডা প্রভৃতির মতো দেশ উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে। আমাদের দেশে শারীরিক শ্রমকে বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখা হয় না। তার ফলে আজো সুজলা–সুফলা–শস্য–শ্যামলা দেশের অধিবাসী হয়েও আমরা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করি।

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি : সৌভাগ্য আকাশ থেকে পড়ে না। জীবনে সৌভাগ্য অর্জনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম ও নিরন্তর সাধনার দরকার হয়। সব মানুষের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা আছে। পরিশ্রমের দ্বারা সেই সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে হয়। যে মানুষ কর্মকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে, জীবনসংগ্রামে তারই হয়েছে জয়। কর্মের প্রতি নিবেদিত–প্রাণ ব্যক্তি জীবনে সফল সৈনিক হতে পারে। কর্মহীন ব্যক্তি সমাজের বোঝা স্বরূপ। অন্যদিকে শ্রমশীলতাই মানবজীবনের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। আমাদের জীবনে উন্নতি করতে হলে, জীবনে সুখী হতে হলে পরিশ্রমের বিকল্প নেই।

উপসংহার : পরিশ্রম শুধু সৌভাগ্যের নিয়ন্ত্রক নয়, সভ্যতা বিকাশেরও সহায়ক। মানব–সভ্যতার উন্নতি–অগ্রগতিতে শ্রমের অবদান অনস্বীকার্য। আমরা স্বাধীন–সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক। সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন ও সাধনা আমাদের। তাই কোনো প্রকার শ্রম থেকে আমাদের মুখ ফিরিয়ে থাকলে চলবে না। শ্রমে বিজয়–রথে চড়ে আমাদের উন্নত সভ্যতার সিংহদ্বারে পৌঁছতে হবে।

৭ পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা

সূচনা : মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা, অসীম কৌতূহল। তার এই অনন্ত জিজ্ঞাসা, অন্তহীন জ্ঞান ধরে রাখে বই। আর বই সংগৃহীত থাকে পাঠাগারে। পাঠাগার হলো সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির এক বিশাল সংগ্রহশালা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় : "এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।" পাঠাগারের বইয়ের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে আছে মানবসভ্যতার শত শত বছরের ইতিহাসের হৃদয়-স্পন্দন।

পাঠাগার কী : পাঠাগার বলতেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এমন একটি বাড়ি বা ঘর, যেখানে অনেক বই সংগ্রহ ও সংরক্ষিত থাকে। পাঠাগারের শাব্দিক প্রতিশব্দ হচ্ছে পুস্তকাগার, গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরি। শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শোনা যায়, পাঠাগারের মধ্যে তেমনি মানুষের হৃদয়ের উত্থান–পতনের ধ্বনি শোনা যায়। পাঠক এখানে স্পর্শ পায় সভ্যতার এক শাশ্বত ধারার, অনুভব করে মহাসমুদ্রের শত শত বছরের কলরোল ধ্বনি, শুনতে পায় জগতের এক মহা ঐকতানের সুর। তাই পাঠাগার বা লাইব্রেরি হচ্ছে মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন।

পাঠাগারের ইতিহাস : পাঠাগারের ইতিহাস বেশ পুরনো। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের অনেককাল আগে থেকেই পাঠাগারের প্রচলন ছিল। তখন মানুষ তার জ্ঞান সঞ্চিত করে রাখত পাথর, পোড়া মাটি, পাহাড়ের গা, প্যাপিরাস, ভূর্জপত্র বা চামড়ায়। আর এগুলো সংরক্ষণ করা হতো লেখকের নিজের বাড়িতে, মন্দির– উপাসনালয়ে এবং রাজকীয় ভবনে। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরে পাঠাগারের অস্তিত্ব ছিল। প্রাচীন গ্রিসেও পাঠাগার ছিল বলে

প্রমাণ রয়েছে। ভারতে প্রাচীনকালে পন্ডিতদের ব্যক্তিগত পাঠাগার ছিল। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ বিহারসহ বিভিন্ন উপাসনালয়, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিক্রমশীলায় সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে ওঠে। এছাড়া আসিরিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, বাগদাদ, দামেস্ক, চীন, তিব্বতসহ বহুস্থানে পৃথিবী–বিখ্যাত পাঠাগারের সন্ধান পাওয়া যায়।

পাঠাগারের বিকাশ : আধুনিক কালে বিজ্ঞানের সহায়তায় উন্নত পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত পাঠাগারের মধ্যে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, মস্কোর লেনিন লাইব্রেরি, ফ্রান্সের বিব্লিওথিক্ নাৎসিওনাল লাইব্রেরি, ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অব কংগ্রেস, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি উলেরখযোগ্য। আমাদের দেশে ঢাকায় 'কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৩ সালে। এই লাইব্রেরির সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি–বেসরকারি পর্যায়ে শতাধিক পাঠাগার পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া ঢাকায় বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি, রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়াম, খুলনার উমেশচন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগার সবিশেষ উলেরখযোগ্য। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার স্থাপন করে মানুষের জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করার প্রচেস্টা আরো বেগবান হয়েছে। ঢাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বাংলাদেশে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের প্রচলন করে আলোকিত মানুষ গড়ার কাজে নিরলস চেস্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

পাঠাগারের শ্রেণিবিভাগ : বিশ্বে নানা রকম পাঠাগার রয়েছে। তার মধ্যে ব্যক্তিগত পাঠাগার, পারিবারিক পাঠাগার, সাধারণ পাঠাগার, জাতীয় পাঠাগার উলেরখযোগ্য। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পাঠাগারের পরিসর সীমিত। সাধারণ পাঠাগার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত, তাই এর পরিসর অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিরকের প্রয়োজনে যে পাঠাগার গড়ে ওঠে সেগুলো প্রাতিষ্ঠানিক পাঠাগার। বিশ্বের প্রতিটি দেশেই রাষ্ট্রীয়ভাবেও পাঠাগার স্থাপন করা হয়ে থাকে। এগুলোই জাতীয় পাঠাগার।

পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা : মানুষের শরীরের জন্য যেমন খাদ্যের দরকার, তেমনি মনের খাদ্যও তার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে পারে পাঠাগার। পাঠাগার মানুষের ক্লান্ত, বুভুবু মনকে আনন্দ দেয়। তার জ্ঞান প্রসারে রুচিবোধ জাগ্রত করে। পাঠাগারে সংগৃহীত থাকে নানা মত ও পথের বই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় : "লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোন পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোন পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোন পথ মানব হৃদয়ের অতল স্পর্শ করিয়াছে। যে যেদিকে ইচ্ছা ধাবমান হও কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।" সমৃদ্ধ পাঠাগার সব ধরনের পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করে; মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে অবদান রাখে। বই ছাড়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করা যায় না। তাই পাঠাগারের মাধ্যমেই একটি জাতি উন্নত, শিরিত ও সংস্কৃতিবান জাতি হিসেবে গড়ে ওঠে। জাতীয় জীবনে তাই পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ : "গ্রন্থাগারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে সংহতি যা দেশ গড়া কিংবা রৰার কাজে রাখে অমূল্য অবদান।" বই পড়ার যে আনন্দ মানুষের মনে, তাকে জাগ্রত করে তুলতে আজ সব পাঠাগারের ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন।

উপসংহার : পাঠাগার মানবসভ্যতার অগ্রগতির ধারাবাহিক ইতিহাস, মানব–হৃদয়ের মিলনৰেত্র। সুস্থ সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাতে পাঠাগার একান্ত অপরিহার্য। স্কুল–কলেজের উপরে পাঠাগারের স্থান। জাতির প্রকৃত জ্ঞানার্জন ও প্রাণশক্তির বৃদ্ধির জন্য স্কুল-কলেজের মতো দেশের সবখানে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা আজ অত্যন্ত জরুরি।

৮ কর্মমুখী শিৰা

সূচনা : শিৰা জাতির মেরুদণ্ড। শিৰা ছাড়া জীবন অপূর্ণ। কিন্তু যে শিৰা বাস্তব জীবনে কাজে লাগে না, সে শিৰা অর্থহীন। এ ধরনের শিৰায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বোঝা বাড়ে। তাই জীবনভিত্তিক শিৰাই প্রকৃত শিৰা। আর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত যে শিৰা সেটিই কর্মমুখী শিৰা। একমাত্র কর্মমুখী শিৰাই হচ্ছে আমাদের বাস্তব জীবনের সহায়ক।

কর্মমুখী শিৰা কী : কর্মমুখী শিৰা হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে তার আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার লৰ্যে বিশেষ কোনো কর্মে প্রশিৰিত করে তোলা। অর্থাৎ যে শিৰাব্যবস্থায় মানুষ কোনো একটি বিষয়ে হাতে–কলমে শিৰা লাভ করে এবং শিৰা শেষে জীবিকার্জনের যোগ্যতা অর্জন করে, তাকেই কর্মমুখী শিৰা বলে। কর্মমুখী শিৰাকে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিৰাও বলা হয়ে থাকে।

কর্মমুখী শিৰার প্রকারভেদ : কর্মমুখী শিৰা যান্ত্রিক শিৰা নয়। জীবনমুখী শিৰার পরিমণ্ডলেই তার অবস্থান। তাই পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক জীবনবোধের আলোকে কর্মমুখী শিৰা দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হলো– উচ্চতর কর্মমুখী শিৰা। এটিতে যারা বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শী তারা– বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ ইত্যাদি স্বাধীন পেশা গ্রহণ করতে পারে। চাকরির আশায় বসে থাকতে হয় না। আরেকটি হলো– সাধারণ কর্মমুখী শিৰা। এর জন্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিৰার দরকার হয় না। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিৰাই যথেস্ট। সাধারণ কর্মমুখী শিৰার মধ্যে পড়ে কামার, কুমার, তাঁতি, দর্জি, কলকারখানার কারিগর, মোটরগাড়ি মেরামত, ঘড়ি-রেডিও-টিভি-ফ্রিজ মেরামত, ছাপাখানা ও বাঁধাইয়ের কাজ, চামড়ার কাজ, গ্রাফিক্স আর্টস, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, মৎস্য চাষ, হাঁসমুরগি পালন, নার্সারি, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি। এ শিৰায় শিৰিত হলে কারোই বেঁচে থাকার জন্য ভাবতে হয় না।

কর্মমুখী শিৰার প্রয়োজনীয়তা : মানুষের মেধা ও মননকে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন শিৰার। তাই মানুষকে সেই শিৰাই গ্রহণ করা উচিত, যে শিৰা তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনধারার উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সৰম হয়। বাংলাদেশের অশিৰা ও অপরিকল্পিত পুঁথিগত শিৰাব্যবস্থার কারণে প্রায় দেড় কোটি লোক কর্মহীন। এ দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীবন সম্পৃক্ত ও উপার্জনৰম কর্মমুখী শিৰাব্যবস্থা প্রবর্তন জরুরি। কর্মমুখী শিৰা আত্মকর্মসংস্থানের নানা সুযোগ সৃষ্টি করে। ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তোলে। এ শিৰা ব্যক্তি ও দেশকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কর্মমুখী শিৰায় দৰ জনশক্তিকে আমরা বিদেশে পাঠিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও কর্মমুখী শিৰাব্যবস্থাকে শিল্প, বিজ্ঞান, কারিগরি উন্নয়ন ও অগ্রগতি

সাধনের উপযোগী করে তোলা অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।

কর্মমুখী শিৰার প্রসার : কর্মমুখী শিৰার গুরুত্ব আজ সর্বত্র স্বীকৃত। এর মাধ্যমে হাতে–কলমে শিৰা গ্রহণ করে শিৰার্থীরা পেশাগত কাজের যোগ্যতা অর্জন করে এবং দৰ কর্মী হিসেবে কর্মৰেত্রে যোগ দেয়। কর্মমুখী শিৰা প্রসার ও উৎকর্ষ সাধন বিনা কোনো জাতির কৃষি, শিল্প, কল–কারখানা, অন্যান্য উৎপাদন এবং কারিগরি ৰেত্রে উন্নতি সম্ভব নয়। বাংলাদেশে কর্মমুখী শিৰার ৰেত্র ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশে প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট; লেদার ও টেক্সটাইল টেকনোলজি কলেজ, গ্রাফিক্স আর্টস্ কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো কর্মমুখী শিৰা প্রসারে ভূমিকা রাখছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। তাই আমাদের দেশে সরকার ও জনগণের সক্রিয় প্রচেষ্টায় আরো অনেক কর্মমুখী শিৰাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে কর্মমুখী শিৰা প্রসারের ৰেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদৰেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে স্কুল ও মাদ্রাসায় নবম ও দশম শ্রেণিতে বেসিক ট্রেড কোর্স চালু, কৃষিবিজ্ঞান, শিল্প, সমাজকল্যাণ ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত; পলিটেনিক ইনস্টিটিউটে ডবল শিফট চালু ইত্যাদি উলেৱখযোগ্য।

উপসংহার : বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার দেশ। কর্মমুখী শিৰার মাধ্যমে এ জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। দৰ জনশক্তি দেশের সম্পদ; উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। তাই আমাদের দেশে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ব্যাপকভাবে কর্মমুখী শিৰার প্রসার ঘটানো দরকার।

৯ অধ্যবসায়

সূচনা : ব্যর্থতা কেউ চায় না। সবাই সাফল্য খোঁজে। কিন্তু কেউই সব কাজে একবারে সফল হয় না। সফলতার জন্য বারবার চেষ্টা করতে হয়। কোনো কাজে সাফল্য লাভের জন্য বারবার এই চেষ্টার নামই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় ছাড়া জীবনে উন্নতি লাভ করা যায় না। অধ্যবসায়ই হচ্ছে মানবসভ্যতার অগ্রগতির চাবিকাঠি।

অধ্যবসায় কী : অধ্যবসায় শব্দের আভিধানিক অর্থ অবিরাম সাধনা, ক্রমাগত চেষ্টা। কোনো নির্দিষ্ট লৰ্যে পৌঁছানোর জন্য অবিরাম সাধনা বা ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াকে বলে অধ্যবসায়। ব্যর্থতায় নিরাশ না হয়ে কঠোর পরিশ্রম আর ধৈর্যের সাথে অভীষ্ঠ লৰ্যে পৌঁছানোর মধ্যেই অধ্যবসায়ের সার্থকতা নিহিত।

অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা : ব্যর্থতাই সফলতার প্রথম সোপান। ব্যর্থতা থেকে সাধনার শুরু, আর সফলতার মাধ্যমে তার শেষ। তাই মানবজীবনে সাধনা বা অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই। অধ্যবসায়ী মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। এমনকি অধ্যবসায়ের গুণেই মানুষ পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করতে পারে। তাই মানবজীবনে অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ছাত্রজীবনে অধ্যবসায় : ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ছাত্রজীবনই ভবিষ্যৎ গড়ার উপযুক্ত সময়। এ সময় ব্যর্থ হলে সম্পূর্ণ মানবজীবনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যে ছাত্র অধ্যবসায়ী, সাফল্য তার হাতের মুঠোয়। অলস ছাত্র–ছাত্রী মেধাবী হলেও পড়াশোনায় কখনো সফল হতে পারে না। কঠোর অধ্যবসায় ছাড়া কোনো কাজেই জয়ী হওয়া যায় না। ছাত্রজীবনেই এই সত্য উপলব্ধি করে নিজেকে অধ্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে কবি কালীপ্রসন্ন ঘোষের বিখ্যাত উক্তি :

> পারিব না একথাটি বলিও না আর,
> কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার,
> একবার না পারিলে দেখ শতবার।

অধ্যবসায় ও প্রতিভা : অধ্যবসায় প্রতিভার চেয়ে অনেক বড়। মনীষী ভল্‌তেয়ারের ভাষায়, ‘প্রতিভা বলে কোনো কিছু নেই। পরিশ্রম ও সাধনা করে যাও তাহলে প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে।’ ডালটন বলেছেন, ‘লোকে আমাকে প্রতিভাবান বলে; কিন্তু আমি পরিশ্রম ছাড়া আর কিছু জানি না।’ বিজ্ঞানী নিউটনের উক্তি, ‘আমার আবিষ্কার প্রতিভা–প্রসূত নয়, বহু বছরের অধ্যবসায় ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ফল।’ এ থেকেই বোঝা যায়, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম ছাড়া শুধু প্রতিভার কোনো মূল্য নেই। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা অধ্যবসায় দ্বারাই নিজের কাজকে সুসম্পন্ন করে তোলেন। আবার অধ্যবসায়ের দ্বারা অনেকে প্রতিভাবান হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।

অধ্যবসায়ের উদাহরণ : পৃথিবীতে যেসব মনীষী সাফল্যের উচ্চ শিখরে অরোহণ করে অমরত্ব লাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন অধ্যবসায়ী। স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস ও ফ্রান্সের বিখ্যাত ঐতিহাসিক কার্লাইল অধ্যবসায়ের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রবার্ট ব্রুস বারবার ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েও যুদ্ধ–জয়ের আশা ও চেষ্টা ত্যাগ করেননি। ষষ্ঠবার পরাজিত হয়ে তিনি যুদ্ধ চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন একটি মাকড়সা বারবার কড়িকাঠে সুতা বাঁধবার চেষ্টা করছে এবং ব্যর্থ হচ্ছে। এইভাবে ছয়বার ব্যর্থ হয়ে সপ্তমবারে মাকড়সাটি সফল হলো। এই দেখে রবার্ট ব্রুসও সপ্তমবার যুদ্ধ করে ইংরেজদের পরাজিত করেন এবং স্কটল্যান্ডের ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। মনীষী কার্লাইল তাঁর লেখা ফরাসি বিপৱবের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি এক বন্ধুকে পড়তে দিয়েছিলেন। বন্ধুর বাড়ির কাজের মহিলা সেটিকে বাজে কাগজ ভেবে পুড়িয়ে ফেলেন। কার্লাইল এতে একটুও দমে যাননি। তিনি আবার চেষ্টা করে বইখানা লিখে বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছিলেন। সম্রাট নেপোলিয়ান, আব্রাহাম লিঙ্কন, ক্রিস্টোফার কলম্বাস প্রমুখ মনীষীর জীবনও অধ্যবসায়ের এক বিরাট সাৰ্য। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অধ্যবসায়ের গুণেই আজ বিশ্ববিখ্যাত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা বাঙালিমাত্রই তাঁদের জন্য গর্বিত।

উপসংহার : অধ্যবসায় হচ্ছে জীবনসংগ্রামের মূল প্রেরণা। এ সংগ্রামে সফলতা ও ব্যর্থতা উভয়ই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে অধ্যবসায়ী মানুষ জীবনের সব ব্যর্থতাকে সাফল্যে পরিণত করতে পারে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, জীবনে সাফল্যের জন্য অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই।

১০ স্বদেশপ্রেম

সূচনা : মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার জন্মস্থানকে ভালোবাসে। জন্মস্থানের আলো–জল–হাওয়া, পশু–পাখিসবুজ প্রকৃতির সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জন্মস্থানের প্রতিটি ধূলিকণা তার কাছে মনে হয় সোনার চেয়েও দামি। সে উপলব্ধি করে–

> মিছা মণি মুক্তা–হেম স্বদেশের প্রিয় প্রেম

তার চেয়ে রত্ন নাই আর।

মানুষের এই উপলব্ধিই হচ্ছে স্বদেশপ্রেম।

স্বদেশপ্রেমের সংজ্ঞার্থ : স্বদেশপ্রেম অর্থ হচ্ছে নিজের দেশের প্রতি, জাতির প্রতি, ভাষার প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করা। দেশের প্রতি প্রবল অনুরাগ, নিবিড় ভালোবাসা এবং যথার্থ আনুগত্যকে দেশপ্রেম বলে। জন্মভূমির স্বার্থে সর্বস্ব ত্যাগের সাধনাই স্বদেশপ্রেম ।

স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ : স্বদেশ অর্থ নিজের দেশ। নিজের দেশকে সবাই ভালোবাসে। মাকে যেমন সবাই নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসে, তেমনি স্বদেশের প্রতিও সবার ভালোবাসা সকল স্বার্থের উর্ধ্বে। প্রত্যেক মানুষেরই কথায়, চিন্তায় ও কাজে প্রকাশ পায় স্বদেশের প্রতি নিবিড় মমত্ববোধ। এই বোধ বা চেতনা হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত। তাই এডউইন আর্নল্ড বলেছিলেন, ‘জীবনকে ভালোবাসি সত্যি, কিন্তু দেশের চেয়ে বেশি নয়।’ সংস্কৃত শেস্নাকে আছে : “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।” অর্থাৎ জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি : দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে জন্ম হয় স্বদেশপ্রেমের। পৃথিবীর সব জায়গার আকাশ, চাঁদ, সূর্য এক হলেও স্বদেশপ্রেমের চেতনা থেকে মানুষ নিজের দেশের চাঁদ–সূর্য–আকাশকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে ভালোবাসে। স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি সবচেয়ে বেশি প্রকাশিত হয় দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হলে। তখন স্বদেশপ্রেমের প্রবল আবেগে মানুষ নিজের জীবন দিতেও দ্বিধা করে না। কেননা সে জানে, দেশের জন্য ‘নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ৰয় নাই তার ৰয় নাই।”

ছাত্রজীবনে স্বদেশপ্রেম : ছাত্ররাই দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। দেশের উন্নতি ও জাতির আশা পূরণের আশ্রয়স্থল। তাই দেশ ও জাতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ ছাত্রজীবনেই জাগিয়ে তুলতে হবে। দেশকে ভালোবাসার উজ্জীবন মন্ত্রে দীৰিত হতে হবে। ছাত্রদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেই দেশের স্বার্থে প্রয়োজনে জীবন উৎসর্গ করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। তাদের কণ্ঠে উচ্চারিত হবে বিদ্রোহী কবির বাণী :

আমরা রচি ভালোবাসার আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গ–পথের আভাস দেখায় আকাশ-ছায়াপথ।
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সফল।
আমরা ছাত্রদল॥

বাঙালির স্বদেশপ্রেম : পৃথিবীতে যুগে যুগে অসংখ্য দেশপ্রেমিক জন্মেছেন। তাঁরা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করে অমর হয়ে আছেন। বাংলাদেশেও তার অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে এ দেশে বিদেশি শক্তি প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করেছে, আর স্বদেশপ্রেমিক বাঙালি দেশের স্বাধীনতা ও সম্মান রৰার্থে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানি স্বৈর-শাসকের হাতে বাংলা-ভাষার জন্য রফিক, শফিক, সালাম, জব্বার, বরকতের আত্মদান দেশপ্রেমের ৰেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মদান করেছে অসংখ্য ছাত্র-শিৰক, কৃষক-শ্রমিক, সাংবাদিকবুদ্ধিজীবী, মা–বোনসহ সাধারণ মানুষ। অকুতোভয় শত-সহস্র এ সৈনিকের দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এখনো এদেশের লৰকোটি জনতা দেশের সামান্য ৰতির সম্ভাবনায় বজ্রকণ্ঠে গর্জে ওঠে।

স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম : স্বদেশপ্রেম মূলত বিশ্বপ্রেমেরই একটি অংশ। কেননা বিশ্বের সব মানুষই পৃথিবী নামক এই ভূখণ্ডের অধিবাসী। তাই স্বদেশপ্রেমের মাধ্যমে সকলেরই বিশ্বভ্রাতৃত্ব, মৈত্রী ও বিশ্ব–মানবতাকে উচ্চকিত করে তুলতে হবে। কারণ বিশ্বজননীর আঁচল–ছায়ায় দেশজননীর ঠাঁই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেজন্যই গেয়েছেন–

ও আমার দেশের মাটি, তোমার ’পরে ঠেকাই মাথা,
তোমাতে বিশ্বময়ীর – তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥

উপসংহার : দেশপ্রেম একটি নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ আত্মানুভূতি। কোনো প্রকার লোভ বা লোভের বশবর্তী হয়ে দেশকে ভালোবাসা যায় না। প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাছে দেশের মঙ্গলই একমাত্র কাম্য। দেশের জন্য তাঁরা সর্বস্ব দান করতে পারেন। তাঁদের শৌর্য-বীর্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তা আবহমানকাল ধরে জাতিকে প্রেরণা যোগায়। কাজেই ব্যক্তিস্বার্থ নয়, দেশ ও জাতির স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দিতে হবে। দেশ গড়ার কাজে, দেশের জন্য মঙ্গলজনক কাজে আমাদের সকলকে নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। সর্বোপরি দেশকে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে ভালোবাসতে শিখতে হবে। তবেই অর্জিত হবে স্বদেশপ্রেমের চূড়ান্ত সার্থকতা।

[অতিরিক্ত অংশ]

১১ আমাদের দেশ

সূচনা : সুজলা–সুফলা, শস্য–শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। সবুজে ঘেরা, পাখি ডাকা দেশটির রূ পের কোনো শেষ নেই। কবির দেশ, বীরের দেশ, গানের দেশ, মায়ের দেশ– এ রকম অনেক নামে এ দেশকে ডাকা হয়। দেশের অবারিত ফসলের ৰেত, মাঠ–ঘাট, প্রকৃতি প্রভৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাই কবি গেয়ে উঠেছেন–

“এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।”

অবস্থান ও আয়তন : বাংলাদেশ দৰিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন দেশ। এর সীমান্তের অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে ভারত। আর দৰিণ–পূর্বের সামান্য অংশে মিয়ানমার এবং দৰিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। এ দেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

স্বাধীনতা লাভ : ১৯৭১ সালে এক রক্তৰয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এই স্বাধীনতা বাঙালি জাতির জীবনে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল একটি অধ্যায়। সুদীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন–শোষণে বাঙালি জাতি ছিল দিশেহারা। পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশদের দুশো বছরের অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে আবার শুরব হয় পাকিস্তানিদের অপশাসন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এই সময়কালে পাকিস্তানি শাসকচক্রের অত্যাচারে বাঙালি জাতি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তারা স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র হাতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশেষে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে দীর্ঘ নয় মাসের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে নাম লেখায় আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ।

জনসংখ্যা : জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। বর্তমানে দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। আয়তনের তুলনায় এই জনসংখ্যা অনেক বেশি। ফলে প্রতিনিয়ত এই দেশকে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ সামলাতে হচ্ছে। এই জনসংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মানুষ বাস করে ঢাকা শহরে।

ভাষা : বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এ দেশে অনেক জাতি–গোষ্ঠীর লোক বাস করে। যেমন– চাকমা, মারমা, মুরং, সাঁওতাল, খুমি, লুসাই, বম, খেয়াং, রাখাইন ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা। তবে বাংলা–ই আমাদের রাষ্ট্রভাষা।

ভূ–প্রকৃতি : বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। এ দেশের প্রায় সবটাই সমভূমি। তবে সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কুমিলরার কিছু অংশে পাহাড় রয়েছে। এছাড়া রয়েছে শত–সহস্র আঁকাবাঁকা নদ–নদী।

ঋতুবৈচিত্র্য : বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। প্রতি দুই মাসে একটি করে ঋতুর পালাবদল ঘটে। একেক ঋতুতে প্রকৃতি একেক সাজে সেজে ওঠে। প্রতিটি ঋতুর সৌন্দর্যই অতুলনীয়। এ দেশের অপরূ প প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মূল কারণ এই ঋতুবৈচিত্র্য। এ দেশে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ছয়টি ঋতু বিদ্যমান। বৈশাখ মাস থেকে প্রতি দুই মাস অন্তর একটি করে ঋতু ধরা হয়।

জনজীবনের বৈচিত্র্য : বাংলাদেশে আছে নানা ধর্মের, নানা পেশার লোকজন। ধর্মীয় দিক থেকে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিষ্টানই প্রধান। এছাড়া পেশার ৰেত্রে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, কৃষক, কামার, কুমোর নানা পেশার মানুষ। বাঙালি ছাড়াও দেশে বিভিন্ন জাতি–গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। তাদের আছে নিজস্ব জীবনযাপন পদ্ধতি। সব ধরনের মানুষ এ দেশে মিলেমিশে থাকে।

অর্থনৈতিক অবস্থা : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। অর্থাৎ সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে পরিচিত হওয়া থেকে এখনও আমরা অনেক পিছিয়ে। তবে আমাদের অর্থনীতি খুবই দ্রবত বিকাশ লাভ করেছে। এ দেশ মূলত কৃষিনির্ভর হলেও বিভিন্ন শিল্পখাত থেকে আমরা অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি। তাছাড়া আমরা প্রশিৰিত জনগোষ্ঠীর সাহায্যে বিভিন্ন দেশ থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা লাভ করি।

প্রাকৃতিক সম্পদ : বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। প্রাকৃতিক গ্যাস আমাদের প্রধান সম্পদ। এছাড়াও রয়েছে কয়লা, চুনাপাথর, খনিজ তেল, আকরিক, চীনামাটি প্রভৃতি। এসব খনিজ সম্পদ উত্তোলনের মাধ্যমে নাগরিক জীবনে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ তেল–গ্যাস অনুসন্ধান কমিটি দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

উপসংহার : বাংলাদেশ আমাদের গর্ব ও অহংকার। অনেক আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা এ দেশকে স্বাধীন করেছি। দেশকে আমরা মায়ের মতো ভালোবাসি। এ দেশে রয়েছে মনোরম প্রকৃতি। পাহাড়, নদী, গাছপালা, দৰিণে বঙ্গোপসাগর দেশের সৌন্দর্যকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে। তাই দেশের সৌন্দর্যে সকলেই মুগ্ধ হয়।

১২ আমাদের গ্রাম

সূচনা : ‘আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান
আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।’

আমাদের গ্রামের নাম ঘোপাল। গ্রামটি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানায় অবস্থিত। গ্রামের এক পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ফেনী নদী।

সৌন্দর্য : আমাদের গ্রামটি ছবির মতো সুন্দর। আম, কাঁঠাল, বটসহ নানা রকম গাছ গাছালিতে গ্রামটি ঘেরা। চারদিকে সবুজ আর সবুজ। বিভিন্ন মৌসুমে ফোটে নানারকম ফুল। গ্রামের মেঠো পথ, সোনালি ধানৰেত, ছায়া ঢাকা বাঁশঝাড় দেখলে মন জুড়িয়ে যায়। প্রকৃতি যেন আপন খেয়ালে গ্রামটিকে সাজিয়েছে।

গ্রামের মানুষ : আমাদের গ্রামে প্রায় দেড় হাজার লোকের বাস। এখানে আছে নানা পেশার, নানা ধর্মের মানুষ। গ্রামের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে। কেউ ঝগড়া-বিবাদ করে না।

শিৰা প্রতিষ্ঠান : আমাদের গ্রামে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জীবনের প্রথম পাঠ শুরব করে। প্রাথমিক পাঠ শেষ করে ভর্তি হয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। আমাদের গ্রামে একটি সেচ্ছাসেবক নৈশ বিদ্যালয় আছে। যাঁরা লেখাপড়া জানেন না, গ্রামের শিৰিত যুবকেরা তাঁদের সন্ধ্যার পর লেখাপড়া শেখান। আমাদের গ্রামে কোনো নিরৰর লোক নেই।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান : আমাদের গ্রামে যেমন শিৰা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, তেমনি রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানও। যেমন– পোস্ট অফিস, দাতব্য চিকিৎসালয়, কৃষি অফিস ইত্যাদি।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : আমাদের গ্রামের পূর্ব পাশ দিয়ে নদী বয়ে চলেছে। গ্রামের তিন পাশে রাস্তা রয়েছে। দৰিণের রাস্তায় বড় গাড়ি চলে। সব রাস্তায় রিকশা-ভ্যান চললেও গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ হেঁটে চলাচল করে।

আর্থিক অবস্থা : আমাদের গ্রামের মানুষের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি ভালো। গ্রামের মাঠে মাঠে ফলে প্রচুর ধান, পাট, গম, মসুর, সরিষা, আখ ইত্যাদি। বড় বড় পুকুরগুলোতে নানা রকম মাছের চাষ হয়।

সামাজিক অবস্থা : অর্থনৈতিক দিক থেকে আমাদের গ্রাম সচ্ছল। গ্রামের সবাই স্বনির্ভর বলে চুরি-ডাকাতি খুন-খারাবির কোনো বালাই নেই। গ্রামের শতভাগ লোকের অৰরজ্ঞান থাকায় কোনো রকমের কুসংস্কার নেই।

উপসংহার : আমাদের গ্রামকে আমরা সবাই মায়ের মতো ভালোবাসি। গ্রামের উন্নয়নে সবাই মিলেমিশে কাজ করার চেষ্টা করি।

১৩ আমাদের বিদ্যালয়

সূচনা : “বিদ্যালয়, মোদের বিদ্যালয়,
এখানে সভ্যতারই ফুল ফোটানো হয়।”

বিদ্যালয় হচ্ছে ভালো মানুষ গড়ার কারখানা। আমি যে বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করি তার নাম ঘোপাল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়।

অবস্থান : আমাদের বিদ্যালয়টি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার ঘোপাল গ্রামে অবস্থিত। বিদ্যালয়ে আসার জন্য ভালো ব্যবস্থা

রয়েছে। আশপাশের যে কোনো গ্রাম থেকে সহজেই আমাদের স্কুলে আসা যায়।

বিদ্যালয়ের পরিবেশ : বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের গাছ রয়েছে। বিশাল প্রাঙ্গণে দুটি দীর্ঘকায় চারতলা ভবন। তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত তিনটি শাখা রয়েছে। প্রতি শাখার জন্যই রয়েছে আলাদা ও পরিপাটি শ্রেণিকৰ। অধ্যৰ ও দুজন উপাধ্যৰের নিজস্ব মনোরম কৰ রয়েছে। বিভিন্ন অংশে বিভক্ত একটি বড় অফিস রবম আছে। পঞ্চাশ জন শিৰকের জন্য রয়েছে তিনটি সুন্দর কৰ। সেখানে বিভিন্ন ধরনের বই রয়েছে। বিদ্যালয় ভবনের সামনে আছে বিশাল মাঠ।

ছাত্রছাত্রী ও শিৰকমণ্ডলী : আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৮০০। শিৰকগণ আমাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে পড়ান। আমরাও তাঁদের গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি।

লাইব্রেরি : আমাদের বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিটি বেশ সমৃদ্ধ। এখানে নানা ধরনের বই রাখা আছে। লাইব্রেরি থেকে বই ধার করে বাড়িতে নিয়েও পড়া যায়।

খেলাধুলা : আমাদের বিদ্যালয়ের সামনে আছে বড় একটি খেলার মাঠ। এখানে আমরা নানা রকম খেলাধুলা করি। বিদ্যালয়ে একজন ক্রীড়া শিৰক আছেন। তিনি নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা পরিচালনা করে থাকেন।

সৃজনশীল কর্মকাণ্ড : আমাদের বিদ্যালয়ে অনেকগুলো ক্লাব আছে। যেমন– বিতর্ক ক্লাব, বিজ্ঞান ক্লাব, আবৃত্তিচর্চা ক্লাব, শরীরচর্চা ক্লাব ইত্যাদি। এগুলোর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়ে থাকি।

অনুষ্ঠান : আমাদের বিদ্যালয়ে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের বিদ্যালয়টির বেশ সুনাম রয়েছে। প্রতি বছর ফেব্রবয়ারি মাসে আমাদের বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসসহ বিভিন্ন দিবসে নানা রকম আয়োজন থাকে।

ফলাফল : প্রাথমিক শিৰা সমাপনী পরীৰায় প্রতি বছর আমাদের বিদ্যালয় থেকে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী A^+ পায়। জেএসসি ও এসএসসি পরীৰায় ফলাফলও সবার নজর কাড়ে।

উপসংহার : আমাদের বিদ্যালয়টি একটি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়। এরূ প একটি বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত।

১৪ বাংলাদেশের নদ-নদী

সূচনা : বাংলাদেশের বুক জুড়ে জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শত শত নদী। এই নদীগুলো বাংলাদেশের প্রাণ। বাংলার মানুষের জীবনযাপনের সাথে এগুলো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলাদেশকে তাই বলা হয় নদীমাতৃক দেশ।

প্রধান নদ-নদী : বাংলাদেশে শাখা-প্রশাখাসহ নদ-নদীর সংখ্যা প্রায় ২৩০টি। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী।

পদ্মা : পদ্মা বাংলাদেশের প্রধান নদী। ভারতের ওপর দিয়ে গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়ে রাজশাহী অঞ্চল দিয়ে পদ্মা নাম ধারণ করে এটি আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে।

মেঘনা : মেঘনা বাংলাদেশের আরেকটি প্রধান নদী। ভারতের বরাক নদীটি সুরমা ও কুশিয়ারা নামের দুটি শাখায় ভাগ হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। চাঁদপুরের কাছে এসে এ দুটি নদী মিলিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে।

যমুনা : তিব্বতের সানপু নদীটি আসামের মধ্য দিয়ে যমুনা নাম নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ধরলা, তিস্তা ও করতোয়া যমুনার প্রধান উপনদী। বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী যমুনার প্রধান শাখানদী।

ব্রহ্মপুত্র : হিমালয় পর্বতের কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ থেকে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি। নদীটি তিব্বত ও আসামের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রামের কাছে এসে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

অন্যান্য নদী : এ নদীগুলো ছাড়াও আমাদের দেশে রয়েছে আরও অনেক নামকরা নদনদী। সেগুলোর মধ্যে কর্ণফুলী, কুশিয়ারা, বুড়িগঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, শীতলৰ্যা, মধুমতি, সুরমা, তিস্তা ইত্যাদি উলেৰখযোগ্য।

নদীর সৌন্দর্য : বাংলাদেশের নদীগুলোর সৌন্দর্য তুলনাহীন। নদীর বুকের সোনালী স্রোত, পাল তুলে ভেসে চলা নৌকা, নদীর পাড়ের ছবির মতো ঘরবাড়ি ও গাছপালা সবকিছু মিলে অসাধারণ দৃশ্য সৃষ্টি করে। নদীর দু ধারের কাশবন, বাড়ি-ঘর সবকিছু ছবির মতো লাগে। বর্ষায় পানিতে ভরে গেলে নদ-নদীগুলো আরও প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নদ–নদীর প্রভাব : নদীর সঙ্গে আমদের জীবন গভীরভাবে জড়িত। আমাদের যাতায়াতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হচ্ছে নদীপথ। নদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এ দেশের অনেক ব্যবসা–বাণিজ্যকেন্দ্র। আমাদের কৃষিৰেত্র অনেকাংশেই নদীর ওপর নির্ভরশীল। এ দেশের কবি–সাহিত্যিক ও শিল্পীরা নদীকে নিয়ে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য সাহিত্যকর্ম।

নদ-নদীর উপকারিতা : বাংলাদেশকে সবুজে–শ্যামলে ভরে তোলার পেছনে নদ–নদীর ভূমিকা অপরিসীম। নদীর পানিতে বয়ে আসা পলি প্রাকৃতিকভাবে আমাদের মাটিকে উর্বর করেছে। আমাদের কৃষির অগ্রগতিতে তাই নদীর ভূমিকা বেশ গুরবত্বপূর্ণ। কৃষিৰেত্র ছাড়াও নদীগুলো মিঠা পানির মাছের অন্যতম উৎস। নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে অসংখ্য মানুষ। দেশীয় প্রয়োজন মিটিয়েও মাছ বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা হয়। এ ছাড়া পরিবহন–সংক্রান্ত কাজেও নদীকে ব্যবহার করা হয়। এক শ্রেণির মানুষ এ কাজ করেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

নদ-নদীর অপকারিতা : নদীর কিছু অপকারিতাও আমাদের চোখে পড়ে। বর্ষাকালে নদীগুলো ফুলে-ফেঁপে ওঠে। তখন বন্যা দেখা দেয়। এছাড়া নদীর প্রবল স্রোতে ভাঙন শুরব হয়। কখনো কখনো কোনো কোনো গ্রাম ভাঙতে ভাঙতে নদীর মাঝে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়। এর ফলে ৰতিগ্রস্থ হয় মানুষের ঘরবাড়ি, জমিজমা, গাছপালা, গবাদিপশু ও গৃহসামগ্রী। অনেক সময় নদীর প্রবল স্রোতে মানুষের জীবনহানিও ঘটে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় দশ লৰ মানুষ নদীভাঙনের শিকার হয়।

উপসংহার : বাংলাদেশ নদীর দেশ। তাই এদের বাঁচিয়ে রাখা আমাদের সবার দায়িত্ব। নদ-নদীর অবদানেই আমাদের এ বাংলাদেশ সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা হয়েছে।

১৫ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

ভূমিকা : মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জাতীয় জীবনের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। মহান এই সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি প্রমাণ করেছে যে তারা কোনো অন্যায়ের সামনেই মাথা নত করে না। আর এর ফলাফল হিসেবে আমরা পেয়েছি স্বাধীন স্বদেশ ভূমি।

পটভূমি : ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা এই উপমহাদেশ ছেড়ে চলে গেলে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তানের দুটি অংশ ছিল– পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী অর্থাৎ বাঙালিদের উপর নানাভাবে শোষণ ও নির্যাতন চালাত। সব ৰেত্রে বাঙালিদের বঞ্চিত করত। নিরীহ বাঙালি ধীরে ধীরে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরব করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ জয়লাভ করলেও পাকিস্তানি সামরিক সরকার শাসনভার হস্তান্তর করল না। ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ বঙ্গাবন্ধু এক ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেন।

মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ : ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর পাকিস্তানিরা বর্বর আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গাবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৭ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। ১১টি সেক্টরে দেশকে ভাগ করে কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-পুলিশ আনসার সবাই মিলে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৪ঠা ডিসেম্বর ভারতীয় মিত্রবাহিনী আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিলিত হয়ে পাকিস্তানিদের বিরবদ্ধে যুদ্ধ শুরব করে। তাদের সম্মিলিত আক্রমণে হানাদাররা দিশেহারা হয়ে পড়ে। পরাজয় বুঝতে পেয়ে তারা দেশদ্রোহী রাজাকার, আলবদর, আল শামসদের সহায়তায় এদেশের অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা : মুক্তিযুদ্ধের ফলে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বীকৃতি। পেয়েছি আমাদের ন্যায্য অধিকার। তবে এতসব অর্জনের মাঝে হারানোর বেদনাও আমাদের রয়েছে। স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন ত্রিশ লৰ দেশপ্রেমিক জনতা। নির্যাতনের শিকার হয়েছে অসংখ্য মা-বোন। তাই মুক্তিযুদ্ধ আমাদের একই সাথে গর্বের ও বেদনার স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়।

উপসংহার : মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসের এক সোনালি অধ্যায়। এর চেতনাকে নিজেদের মাঝে ধারণ করার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তবেই আমরা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে পারব।

১৬ স্বাধীনতা দিবস

সূচনা : স্বাধীনতা মানে মুক্তি, বন্ধনহীনতা। দীর্ঘ সময় ধরে আমরা ছিলাম পরাধীন একটি জাতি। ১৯৭১ সালে ২৬শে মার্চ তারিখে সেই শৃঙ্খল থেকে চিরতরে মুক্তির লড়াই শুরব হয়। শত্রবর হাত থেকে স্বদেশ ভূমি তখনও মুক্ত না হলেও মনে মনে আমরা নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবতে শুরব করি এদিন থেকেই। তাই ২৬শে মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিবস।

ঐতিহাসিক পটভূমি : স্বাধীনতা দিবসের গৌরব লাভের পেছনে রয়েছে বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর হতে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের অধীন। তখন এর নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। এ দীর্ঘ সময় ধরে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক– সকল দিক দিয়েই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আমাদেরকে শোষণ করে আসছিল। এর প্রতিবাদে বাঙালিরা রবখে দাঁড়ায়। ১৯৪৭–৭১ পর্যন্ত পুরোটা সময়ই বাঙালি তার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছে, ঝরেছে অনেক রক্ত।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার সংগ্রামের ডাক দেন। এরপর আসে ২৫শে মার্চ কালো রাত। পাকিস্তানি হানাদাররা এ রাতে ঢাকা শহরে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে পাকিস্তানিদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গাবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং দেশকে শত্রবমুক্ত করার নির্দেশ দেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েই সর্বস্তরের বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধে। অনেক রক্তৰয়ের পর অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি ।

স্বাধীনতা দিবসের চেতনা : আমরা সবাই স্বাধীন একটি দেশের নাগরিক। স্বাধীনতা দিবসে এ বিষয়টি আমরা আরও ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারি। এ দেশের জন্য শহিদদের অবদানের মূল্য বুঝতে পারি। দেশের প্রতি আমাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। নিজেদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন হই।

উদ্‌যাপন : প্রতি বছর নানা আয়োজনে দেশের মানুষ এই দিনটি উদযাপন করে। সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো সভা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করে। স্কুলগুলোতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সর্বস্তরের মানুষ জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানায়।

উপসংহার : মুক্তির যে বার্তা আমরা ২৬শে মার্চ তারিখে পেয়েছিলাম তা পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়েছে অনেক তাজা প্রাণ আর রক্তের বিনিময়ে। তাই এই অর্জনকে আমরা বৃথা যেতে দেব না। দেশকে ভালোবাসব, দেশের স্বাধীনতা রৰায় সদা সচেষ্ট থাকব।

১৭ বিজয় দিবস

সূচনা : কাল যেখানে পরাজয়ের কালো সন্ধ্যা হয়,
আজ সেখানে নতুন করে রৌদ্র লেখে জয়।

বাঙালির জাতীয় জীবনে ১৬ই ডিসেম্বর এক মহিমান্বিত দিন। এ দিনটি আমাদের বিজয় দিবস। দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রাম শেষে এই দিনেই আমরা চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা লাভে সৰম হই।

পটভূমি : ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের দীর্ঘ ২০০ বছরের শাসনের অবসান ঘটলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। পাকিস্তান আবার দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নতুন করে পরাধীন হয় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাতে। তাদের অত্যাচারে আমাদের মৌলিক অধিকারসমূহ ভূলুণ্ঠিত হয়। আমাদের শিৰা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের ওপরও তারা আঘাত হানে। এমনকি আমাদের মুখের ভাষা পর্যন্ত কেড়ে নিতে চায়। বাংলার সংগ্রামী জনতা তাদের সমস্ত অত্যাচারের বিরবদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয় লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার রাষ্ট্রীয় ৰমতা ছাড়তে চায় না। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ এক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু সমগ্র দেশবাসীকে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমগ্র বাঙালি জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম : বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঘোষণার পর আপস আলোচনার নামে কালৰেপণ করে ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও রসদ এনে শক্তি বৃদ্ধি করে। এরপর ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর। ঐ রাতেই গ্রেফতার করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। গ্রেফতারের আগে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার ঘোষণায় সমগ্র বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়ে সশস্ত্র লড়াইয়ে। এ দেশের অগণিত ছাত্র–জনতা, পুলিশ, ইপিআর, আনসার ও সামরিক, বেসামরিক লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। তারা গেরিলা ও মুখোমুখি যুদ্ধ করে শত্রবসেনাকে পর্যুদস্ত করে তোলে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে চলতে থাকে স্বাধীনতাযুদ্ধ।

কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ : দীর্ঘ নয় মাসের রক্তৰয়ী সংঘর্ষের পর লৰ প্রাণের বিনিময়ে অবশেষে বাঙালি জাতি লাভ করে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কাছে সম্পূর্ণরূ পে পর্যুদস্ত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আসে বাঙালি জাতির জীবনের সেই মাহেন্দ্রৰণ। সেদিন বিকেল ৫টা ১ মিনিট ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে। ঐতিহাসিক এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে পালিত হয় মহান বিজয় দিবস।

বিজয় দিবস উদ্‌যাপন : প্রতিবছর ১৬ ডিসেম্বর চরম উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সারা দেশে পালিত হয় মহান বিজয় দিবস। এদিন সারা দেশে সরকারি ভবনসমূহ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হয়। সারা দেশে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। সকালে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। পত্রপত্রিকাগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। টিভি ও রেডিও চ্যানেলগুলো প্রচার করে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা। এভাবে সমগ্র বাঙালি জাতির কাছে বিজয় দিবস হয়ে ওঠে উৎসবের দিন।

বিজয় দিবসের চেতনা : বিজয় দিবস আমাদের দেশপ্রেমকে শাণিত করে। আমরা অন্যায়ের বিরবদ্ধে মাথা উঁচু করে লড়াই করার প্রেরণা পাই। দেশের সার্বভৌমত্ব রৰায় নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হই। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতে শিখি এই দিনে।

উপসংহার : লাখো মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে মহান স্বাধীনতা। ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের সেই গৌরবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এসেছে। আজ আমরা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক। লৰ লৰ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীনতার আনন্দ আমাদেরকে দেশপ্রেমী করে। মহান বিজয় দিবসে বাঙালি উক্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমুজ্জ্বল হয়।

১৮ একুশে ফেব্রবয়ারি

সূচনা : "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রবয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?"

২১শে ফেব্রবয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। ১৯৫২ সালের এ দিনটিতে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে আন্দোলন করেছিল হাজার হাজার বাঙালি। ভাষার জন্য জীবন দিয়েছিলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিকসহ নাম না জানা অনেকে। তাই এই দিনটি আমাদের জন্য একই সাথে গৌরবের ও বেদনার।

একুশে ফেব্রবয়ারির প্রেৰাপট : একুশে ফেব্রবয়ারির ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৪৮ সালেই। তৎকালীন সময়ে ২১ মার্চ পাকিস্তানের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। তখনই বাংলার ছাত্র–জনতা এই ঘোষণার প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। পরবর্তী সময়ে ১৯৫০ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান একই ঘোষণা দিলে ছাত্রসমাজ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এরপর আবারও ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় এক জনসভায় একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। এর প্রতিবাদে বাংলার ছাত্র–জনতা আন্দোলনের ডাক দেয়। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রবয়ারি এ আন্দোলন চূড়ান্ত রূ প লাভ করে। দিনটিতে সর্বস্তরের বাঙালি সরকারি নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। পুলিশ নিরস্ত্র ছাত্র–জনতার ওপর গুলি চালালে নিহত হয় অনেকে। এই হত্যাকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে গোটা দেশের ছাত্র–জনতা। আন্দোলন আরও তীব্রতর হয়। এর ফলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাকে পূর্ববাংলার রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়।

শহিদ মিনার : প্রতিবছর ২১শে ফেব্রবয়ারি আমরা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। ২১শে ফেব্রবয়ারি শহিদ হওয়া আবুল বরকত যে স্থানে শহিদ হয়েছিলেন সেখানে ২৩শে ফেব্রবয়ারি একটি শহিদ মিনার নির্মিত হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিৰার্থীরা রাতারাতি ইট দিয়ে স্মৃতিফলকটি

গড়ে তোলেন। ২৬ তারিখ পুলিশ সেটি ভেঙে দেয়। অবশেষে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পরে ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের কাজ শরব হয়। ১৯৬৩ সালে শহিদ আবুল বরকতের মা এটি উদ্বোধন করেন।

একুশের চেতনা : বায়ান্নর একুশে ফেব্রবয়ারিতে বাঙালি লড়াই করে তার অধিকার আদায় করেছে। তাই এ দিনটি আমাদের মাঝে অধিকার–চেতনা নিয়ে আসে। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের সূচনাও ঘটে ভাষা আন্দোলন থেকেই। তাই এই দিনে আমরা সুন্দর দেশ গড়ার প্রেরণা পাই। অন্যায়ের বিরবদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার সাহস পাই।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি : একুশে ফেব্রবয়ারি আজ পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। এ দিনটি পৃথিবীর সব ভাষার মানুষ মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের। বাংলাদেশে ভাষার জন্য যে জীবনদানের ঘটনা ২১ ফেব্রবয়ারি ঘটেছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। বাঙালির এই আত্মত্যাগের স্বীকৃতি মিলেছে আন্তর্জাতিকভাবে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ ফেব্রবয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই স্বীকৃতির ফলে বিশ্বের দরবারে বাঙালি লড়াকু জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বিশ্ববাসী জানতে পারে বাঙালিরা অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজনে জীবন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

একুশে ফেব্রবয়ারি পালন : প্রতিবছর নানা আয়োজনে এ দিনটি সরকারি ও বেসরকারিভাবে পালন করা হয়। সারা দেশের শহিদ মিনারগুলোতে ভোরবেলা শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানানো হয়। স্কুল–কলেজের ছাত্র–ছাত্রীরা এদিন খালি পায়ে হেঁটে শহিদ মিনারে গিয়ে ফুল দেয়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে বিশেষ ক্রোড়পত্র। টিভি চ্যানেলগুলো প্রচার করে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা।

উপসংহার : একুশ আমাদের অহংকার। এ দিনটি মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি আমাদের ভালোবাসা বাড়িয়ে দেয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে এই দিনটির গুরবত্ব অপরিসীম। এই দিনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালি জাতি বিভিন্ন দুঃসময়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। দেশের জন্য কাজ করেছিল। তাদের মতোই একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা দেশের জন্য কাজ করব।

১৯ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি

অথবা, জাতির জনক বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সূচনা : "যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরী, যমুনা বহমান,
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।"

আপন কীর্তিতে বাংলার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালির আসনটি চিরকালের জন্য অধিকার করে নিয়েছেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। আমাদের জাতির জনক।

জন্ম ও শৈশব : বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বর্তমান গোপালগঞ্জ (তৎকালীন ফরিদপুর) জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আদর করে বাবা তাঁর নাম রাখেন খোকা। শৈশবকাল থেকেই গরিব মানুষদের প্রতি তাঁর ছিল অসামান্য টান। মানুষের দুঃখে-কষ্টে তাদের নানাভাবে সাহায্য করতেন তিনি।

ছাত্রজীবন : সাত বছর বয়সে বঙ্গাবন্ধু ভর্তি হন গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে ১৯৪২ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪২ সালে শেখ মুজিব কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় অন্যায়-অবিচারের বিরবদ্ধে প্রতিবাদে শেখ মুজিব সবসময় থাকতেন সামনের কাতারে।

রাজনৈতিক জীবন : ছাত্রজীবন থেকেই বঙ্গাবন্ধু রাজনীতিতে যুক্ত হন। ভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁকে বহুবার গ্রেপ্তার ও কারাবরণ করতে হয়। কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে থাকাকালীন তৎকালীন মুসলিম লীগে যোগ দেন। আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে শেখ মুজিবকে করা হয় দলের যুগ্ম সম্পাদক। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি জেলে বন্দি অবস্থায় অনশন পালন করেন। ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ঘটলে শেখ মুজিব মন্ত্রী হন। ১৯৬৬ সালে তিনি বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ১৯৬৮ সালে জেলে থাকা অবস্থায় তাঁর বিরবদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করা হয়। ১৯৬৯ সালে প্রবল আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ২৩শে ফেব্রবয়ারি ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র-জনতার বিশাল জনসভায় তাঁকে 'বঙ্গাবন্ধু' অ্যাখ্যা দেওয়া হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বেই আওয়ামী লীগ বিশাল বিজয় অর্জন করে।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ : ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রায় দশ লাখ লোকের উপস্থিতিতে বঙ্গাবন্ধু এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে জাতিকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি দৃঢ়চিত্তে বলেন :

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

স্বাধীনতার ঘোষণা : ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ রাতে পাক হানাদার বাহিনী এদেশের মানুষের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গাবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান। সেই ডাকে সাড়া দিয়েই বাংলার মানুষ লড়াই করে দেশকে শত্রবমুক্ত করে।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন : ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গাবন্ধু তাঁর প্রিয় দেশবাসীর কাছে ফিরে আসেন। এ পর্যায়ে তাঁর নেতৃত্বে শুরব হয় স্বাধীন বাংলাদেশ পুনর্গঠনের সংগ্রাম।

মৃত্যু : মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিব। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সামরিক বাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্যের হাতে বঙ্গাবন্ধু সপরিবারে শহিদ হন।

উসংহার : বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন তিনি। শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, বিশ্বের সকল মানুষের জন্যই তাঁর আদর্শ চিরস্মরণীয়।

২০ শহিদ বুদ্ধিজীবী

অথবা, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস

সূচনা : শিৰাকে যদি জাতির মেরবদন্ড বলা হয়, তবে বুদ্ধিজীবীরা জাতির মস্তিষ্ক। তাঁদের মেধা, শ্রম ও দেশপ্রেম জাতিকে আলোর পথ দেখায়, জাতি গঠনে সহায়তা করে। আমাদের জাতিসত্তার বিকাশ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূলে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ অবদান রয়েছে।

পাকিস্তানি হানাদারদের তান্ডব : স্বাধীনতা যুদ্ধে আমরা যেমন হারিয়েছি অসংখ্য বীর মুক্তিযোদ্ধাকে, তেমনি হারিয়েছি শত শত দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীকে। দেশদ্রোহী রাজাকার, আল বদর ও আল শামসদের সহায়তায় পাক হানাদার বাহিনী অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের বরেণ্য মানুষদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চের কালরাত থেকে শুরব করে মুক্তিযুদ্ধের একেবারে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত তারা এই হত্যাকান্ড চালায়।

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসের পটভূমি : পাকিস্তানি বাহিনী যখন বুঝতে পারে তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত তখন তারা বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার এক ঘৃণ্য নীলনকশা প্রণয়ন করে। নীলনকশা অনুযায়ী ৭ থেকে ১৪ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত হত্যাযজ্ঞ চালায় তারা। বেছে বেছে শিৰক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পীদের হত্যা করে। এ ঘটনার স্মরণে প্রতিবছরই ১৪ই ডিসেম্বর আমরা 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে পালন করে আসছি।

বুদ্ধিজীবী হত্যার পর্যায় : ১৯৭১-এর বুদ্ধিজীবী হত্যাকে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্ব ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্ব ১লা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। প্রথম পর্বে যাঁদের হত্যা করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে উলেরখযোগ্য হলেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্বী শিৰক এম. মুনিরবজ্জামান, ড. গোবিন্দচন্দ্র দেব, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দার, সুরসাধক আলতাফ মাহমুদ, ভাষা সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা, সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডা. যোগেশচন্দ্র ঘোষ, কুন্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যৰ নতুনচন্দ্র সিংহ প্রমুখ। সাংবাদিক মেহেরবন্নেসা, সেলিনা পারভিন, শহীদ সাবের প্রমুখরাও এই রাতে শহিদ হন।

দ্বিতীয় পর্বের নৃশংসতম হত্যাকন্ডটি ঘটিয়েছে আল বদর বাহিনী। এ পর্বে যাঁদের হত্যা করা হয় তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উলেরখযোগ্য হলেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ও বিশিষ্ট নাট্যকার অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, অধ্যাপক আনোয়ার পাশা, অধ্যাপক রাশীদুল হাসান, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহম্মদ প্রমুখ। তাঁরা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত ছিলেন। সাংবাদিকদের মধ্যে শহীদুলরাহ কায়সার, সিরাজুদ্দীন হোসেন, নিজামউদ্দীন আহমদ, আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা প্রমুখের নাম উলেরখযোগ্য। এছাড়াও ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বিভিন্ন পেশার বিশিষ্টজনদের। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেক বুদ্ধিজীবীর লাশ পাওয়া যায় মিরপুর ও রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে।

উপসংহার : বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। দেশের জন্য ত্যাগের মহা আদর্শ স্থাপন করে গেছেন তাঁরা। সেই আদর্শ অনুসারে আমরা নিজেদের যোগ্য মানুষরূ পে গড়ে তুলব। তবেই আমাদের পৰে তাঁদের ঋণ শোধ করা সম্ভব হবে।

২১ আমার দেখা একটি মেলা

অথবা, একটি লোকজ মেলা

সূচনা : 'মেলা' শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। আৰরিকভাবে 'মেলা' শব্দের অর্থ হলো 'মিলন'। মেলায় পরিচিতিজনদের সঙ্গে দেখা হয় এবং ভাবনিময় হয়। একের সঙ্গে অন্যের সংযোগ ঘটে মেলায়। গ্রামীণ মেলাগুলোতে আমাদের লোকজন সংস্কৃতির পসরা বসে। সেই সাথে পাওয়া যায় নির্মল বিনোদনের নানা উপায়।

মেলার প্রচলন : অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে মেলার প্রচলন ছিল। তবে পূর্বে মেলার আয়োজন করা হতো সুনির্দিষ্ট কিছু স্থানে এবং বৃহৎ পরিসরে। বর্তমানে দেশের প্রায় সব স্থানেই মেলা বসে। কোনো কোনোটির আয়োজন অনেক বড়, আবার কোনোটির ক্ষুদ্র। তবে মেলার আনন্দ এখন আগের মতোই রয়েছে।

মেলার উপলৰ্যে : আমাদের দেশে বেশির ভাগ মেলা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দুদের দুর্গাপূজা, রথযাত্রা, দোল উৎসব, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি উপলৰ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের ১০ই মহরমকে কেন্দ্র করে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধদের বৌদ্ধপূর্ণিমা উপলৰ্যেও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া চৈত্রসংক্রান্তি ও বাংলা নববর্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আমার দেখা মেলার উপলৰ্য ছিল পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ।

মেলার স্থান : সাধারণত খোলা কোনো বৃহৎ স্থানে, যেখানে মানুষের চলাচল রয়েছে, তেমন স্থানেই মেলা অনুষ্ঠিত হয়। আমি যে মেলাটি দেখেছি, সেটি বসেছিল নদীর ধারের বিশাল একটি বটগাছের নিচে।

মেলার প্রস্তুতি : পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ বাঙালির সবচেয়ে আনন্দের দিন। এদিনকে উপলৰ্য করে মেলার প্রস্তুতি ছিল বিশাল। অস্থায়ীভাবে বটগাছের চারদিকে দোকানপাট তৈরি করা হয়। একদিকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যাত্রাপালার জন্য একটি বড় মঞ্চ তৈরি করা হয়। কিছু মানুষ মূল স্থানে জায়গা না পেয়ে রাস্তার পাশে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে বসার প্রস্তুতি নেয়। মঞ্চের চারদিকে মাইক লাগানো হয়।

মেলার চিত্র : পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষের দিন থেকে মেলা শুরব হয়। মেলা শুরব হতেই এতে প্রচুর লোকসমাগম দেখা যায়। দোকানগুলো ছিল নানা দ্রব্যসামগ্রীতে কানায় কানায় ভরা। মানুষ রঙিন পোশাক পরে মেলায় আসছিল। ছোট ছেলেমেয়েদের চোখেমুখে ছিল আনন্দের ঝিলিক। তারা ভিড় করে মাটির খেলনা, বেলুন, বাঁশি আরও নানা জিনিসের দোকানে। আর নারীরা ভিড় করেন প্রসাধনসামগ্রী ও চুড়ির দোকানে। এ ছাড়া কাপড়ের দোকানেও তাঁদের ভিড় লৰ করা যায়। মেলায় ছিল নানা বৈচিত্র্যময় খাবারের আয়োজন। ছোলাভাজা, বাদামভাজা, পাঁপরভাজা, ভুট্টার খই, কনক ধানের খই, মুড়কি, বাতাসা,

হাওয়াই মিঠাই ও নানা রকমের মিষ্টি পাওয়া যাচ্ছিল। মেলার একদিকে একটি লোক সাপের খেলা দেখাচ্ছিল। তা দেখতে ভিড় করে অসংখ্য মানুষ। এ ছাড়া ছোটখাটো একটা সার্কসের আয়োজনও ছিল।

মেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সন্ধ্যার সময় মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় শিল্পীদের গান পরিবেশনের পর শুরব হয় যাত্রাপালা। মঞ্চে ভেলুয়া সুন্দরীর পালা পরিবেশন করা হয়। ভেলুয়া সুন্দরীর দুঃখগাথা দেখে অনেকেই আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এর মাধ্যমেই দিনব্যাপী এই মেলাটর সমাপ্তি টানা হয়।

মেলার তাৎপর্য : এ ধরনের গ্রামীণ মেলায় মানুষের সম্প্রীতির এক বন্ধন তৈরি হয়। স্থানীয়ভাবে তৈরি জিনিসের একটি প্রদর্শনী হয় মেলায়। শহুরে মানুষ তার নিজের শেকড় সম্পর্কে জানতে পারে মেলায় এসে। শুধু তাই নয়, এখানে অর্থনৈতিক বিষয়ও যুক্ত থাকে। ক্রেতারা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করার জন্য মেলার ওপর নির্ভর করে। অনেকে মেলাকে ঘিরে গোটা বছরের বিকিকিনির বড় পরিকল্পনাও করে থাকে।

উপসংহার : বাঙালি সংস্কৃতির বিরাট অংশজুড়ে রয়েছে লোকজ মেলা। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের আবহমান গ্রামবাংলার প্রথা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য। গ্রামীণ এই মেলাটি আমাকে অনেক আনন্দ দিয়েছে। আমাদের লোকজ সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি মেলায় গিয়ে।

২২ শহিদ মিনার

ভূমিকা : 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কী ভুলিতে পারি
ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রব গড়ায়ে ফেব্রু য়ারি
আমি কী ভুলিতে পারি'

প্রভাতফেরির এ গান গেয়ে প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমরা শহিদ মিনারে যাই। ফুল দিয়ে ভাষাশহিদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই। শহিদ মিনার এদিন ফুলে ফুলে ছেয়ে যায়। আমাদের মনে করিয়ে দেয় মায়ের ভাষা আমাদের কাছে কত আপন। মাতৃভাষার মর্যাদা রৰা করতেই বাংলার ছেলেরা রাজপথে প্রাণ দিয়েছিল। তাদের স্মৃতি রৰার্থেই নির্মিত হয়েছে শহিদ মিনার।

শহিদ মিনার সৃষ্টির পটভূমি : ১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারি নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ডাকা অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঘোষণা করেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' এ ঘোষণার প্রতিবাদে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবস এবং ১১ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস পালিত হয়। সেখান থেকে ঘোষনা দেওয়া হয় ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা দিবস পালিত হবে। এ ঘোষণার প্রেৰিতে শাসকগোষ্ঠী ২১শে ফেব্রুয়ারিতে সকল প্রকার সভা, মিছিল, মিটিং ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু ছাত্রজনতা সেই বাধাকে ডিঙিয়ে মিছিল নিয়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে মিছিলটি আসতেই পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে নিহত হন সালাম, জব্বার, রফিক, বরক, শফিউরসহ আরও অনেকে। তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে স্মৃতির শহিদ মিনার।

প্রথম শহিদ মিনার : ২১শে ফেব্রুয়ারির শহিদদের স্মৃতি রৰার্থে ২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি অক্লান্ত পরিশ্রম করে ছাত্রজনতা একটি শহিদ মিনার তৈরি করে। শহিদ শফিউরের পিতা ২৪শে ফেব্রুয়ারি এটি উদ্বোধন করেন। কিন্তু কয়েক দিন পরই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ শহিদ মিনারটি ভেঙে ফেলে। তবে বাঙালির হৃদয় থেকে তারা সে মিনারের স্মৃতি মুছে দিতে পারেনি। কবি আলাউদ্দীন আল আজাদের ভাষায় :

ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক
একটি মিনার গড়েছি আমরা চার-কোটি পরিবার

আজকের শহিদ মিনার : বর্তমান শহিদ মিনারটির নকশা করেন স্থপতি হামিদুর রহমান। পরবর্তীকালে শহিদ মিনারটি আরও সংস্কার করা হয়। বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে আমরা যে শহিদ মিনারটি দেখি সেটিই হামিদুর রহমানের চূড়ান্ত নকশার পরিপূর্ণ রূ প। প্রতিবছর মানুষ এ মিনারের সামনেই ভাষাশহিদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বর্তমানে এ শহিদ মিনারের আদলেই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে।

শহিদ মিনারের তাৎপর্য : শহিদ মিনারের মিনার ও তার স্তম্ভগুলো মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার তথা মা ও তাঁর শহিদ সন্তানের প্রতীক। মাঝখানের সবচেয়ে উঁচু স্তম্ভটি মায়ের প্রতীক। চারপাশের ছোট চারটি স্তম্ভ সন্তানের প্রতীক, যারা তাদের বুকের রক্ত ঢেলে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আমাদের জীবনে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু শুভ তার সঙ্গে শহিদ মিনারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এটি শুধু একটি মিনার নয়, এটি আমাদের প্রেরণার প্রতীক। শুধু ভাষা আন্দোলন নয়, মুক্তিযুদ্ধেও শহিদ মিনার আমাদের প্রেরণা যুগিয়েছে। আমাদের যুদ্ধ জয়ের অন্যতম প্রেরণা একুশে ফেব্রুয়ারি। আমরা যখনই অন্যায়ের শিকার হই, তখনি শহিদ মিনার প্রতিবাদ করার জন্য আমাদের প্রেরণা জোগায়।

শহিদ মিনার ও আমদের সংস্কৃতি : আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শহিদ মিনরের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। দেশে যখনই কোনো অন্যায় সংঘটিত হয়, তখনই শহিদ মিনারে হাজির হয়ে তার প্রতিবাদ করা হয়। বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান হয় শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে। কোনো জাতীয় বা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের মৃত্যুর পর তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে রাখা হয়।

উপসংহার : শহিদ মিনার আমাদের প্রেরণার অন্তহীন উৎস। আমরা শহিদ মিনারের দিকে তাকিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ অতীতের কথা ভাবি। আর বর্তমান প্রজন্মের কাছে গর্ব করে সে কথাগুলো বলি। আজ ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পেয়েছে। ভাষার জন্য আমাদের আত্মদানের ইতিহাস ছড়িয়ে গেছে বিশ্বব্যাপী। শহিদ মিনার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। বাঙালির সঙ্গে সঙ্গে গোটা পৃথিবীর মানুষ আজ শহিদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষা শহিদদের অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

২৩ পাহাড়পুর

অথবা, একটি ঐতিহাসিক স্থান

অথবা, একটি দর্শনীয় স্থান

সূচনা : গুরবত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগত কারণে ইতিহাসে মর্যাদা পাওয়া যে কয়টি স্থান বাংলাদেশে রয়েছে তার মধ্যে পাহাড়পুর অন্যতম। এটি বাংলাদেশের এমনকি দুনিয়ার একটি বিখ্যাত স্থান। যা মূলত একটি সুপ্রাচীন বৌদ্ধবিহার।

অবস্থান : পাহাড়পুর বিহারটি বর্তমান রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার 'পাহাড়পুর' গ্রামে অবস্থিত। এর আরেক নাম 'সোমপুর বিহার' বা 'সোমপুর মহাবিহার'।

আবিষ্কারের ইতিহাস : আজ থেকে প্রায় ১৪শ বছর আগে বিহারটি নির্মাণ করা হয়। রাজা দ্বিতীয় ধর্মপাল এটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে দীর্ঘ সময় এটি খালি পড়ে থাকে। অর্থাৎ কোনো কাজে ব্যবহৃত হয়নি। অনেকে মনে করেন, যুগ যুগ ধরে উড়ে আসা ধুলোবালি ও মাটি এর চারদিকে জমতে থাকার কারণে এক সময় মাটির স্তূপে ঢাকা পড়ে এটি পাহাড়ের মতো হয়ে যায়। সেই থেকে এর নাম হয়ে যায় 'পাহাড়পুর'। দীর্ঘকাল পরে ১৮৭৯ সালে আলেকজান্ডার কানিংহাম এটি আবিষ্কার করেন।

নির্মাণশৈলী ও বিবরণ : সুপ্রাচীন এ বিহার এলাকাটি প্রায় ৪০ একর জায়গা জুড়ে লালচে মাটির ভূমিতে বিস্তৃত। ২৭ একর জমির ওপর এর বিশাল দালান। মাটির নিচের অংশে এটি চারকোণা আকারের। বাইরের দেয়ালের গায়ে পোড়ামাটি দিয়ে নানা রকম ফুল-ফল, পাখি, পুতুল, মূর্তি ইত্যাদি বানানো আছে। উত্তর দিকের ঠিক মাঝখানে মূল দরজা। তারপরেই রয়েছে অনেকগুলো ছোট–বড় হলঘর। দেয়ালের ভেতরে সুন্দর সার বাঁধা ১৭৭টি ছোট ছোট ঘর। সামনের দিকে আছে লম্বা বারান্দা। বিহারটিতে আরও আছে পুকুর, স্নানঘাট, কূপ, স্নানঘর, রান্নাঘর, খাবার ঘর ও টয়লেট। সব মিলিয়ে বিহারটিতে ৮০০ মানুষের থাকার ব্যবস্থা ছিল।

অন্যান্য দর্শনীয় স্থাপনা : বিহারের ভিতর বিশাল উঠানের মাঝখানে বড় এক সুন্দর মন্দির। ধাপে ধাপে উঁচু করে বড় মন্দিরটা বসানো হয়েছে। পোড়ামাটির দুই হাজার ফলকের চিত্র দিয়ে মন্দিরের বাইরে আর ভেতরে সাজানো। একই রকম ছোটছোট মন্দির পুরো বিহারের নানান জায়গায় আছে। বিহারটির পূর্ব-দৰিণ কোণে দেয়ালের বাইরে একটা বাঁধানো ঘাট আছে। ওটাকে বলা হয় 'সন্ধ্যাবতীর ঘাট'। পাহাড়পুর বিহারের পাশে আছে দেখার মতো একটা জাদুঘর। সেখানে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা আছে খনন করে পাওয়া অনেক পুরাতন আর দুর্লভ জিনিসপত্র। এই এলাকার একটু দূরেই আছে 'সত্যপীরের ভিটা'। সেখানে অনেকেই ভক্তিভরে প্রার্থনা করে, মানত করে।

গুরবত্ব : বাংলার ধর্মীয় ইতিহাসে পাহাড়পুর এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এটি ছিল বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের উচ্চশিৰার প্রাণকেন্দ্র। এখানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো থেকে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

উপসংহার : পাহাড়পুর বিহারের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গুরবত্ব অনেক। আমাদের সকলেরই উচিত একবারের জন্য হলেও পাহাড়পুর ঘুরে আসা।

২৪ বর্ষাকাল

সূচনা :

সকাল দুপুর
টাপুর টুপুর
রিম–ঝিমা–ঝিম বৃষ্টি।
আকাশ উপুড়
ঝাপুর ঝুপুর
বন্ধ চোখের দৃষ্টি।

ষড়ঋতুর বাংলাদেশে বর্ষা আসে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সাজে। গ্রীষ্মের পরই বর্ষার আগমন ঘটে। আষাঢ়–শ্রাবণ এ দুই মাস মিলে বর্ষাকাল। ঋতুবৈচিত্র্যের এই দেশে এ সময় বাংলা লাভ করে এক ভিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

বর্ষার আবহাওয়া : বর্ষাকালে আকাশ ঢাকা থাকে কালো মেঘে। মেঘের গুরবগম্ভীর গর্জনে প্রকৃতি থেমে থেমে শিউরে ওঠে। ঘন ঘন বৃষ্টি হয়। একটানা কয়েক দিন সূর্যের মুখ দেখা যায় না। প্রচণ্ড ঠান্ডা বাতাস বয়। বিদ্যুৎ চমকায়, কখনো প্রবল ঝড় হয়। টানা বর্ষণের ফলে অনেক সময় বন্যা হয়।

বর্ষার প্রকৃতি : বর্ষার আগমনে প্রকৃতি থেকে মুছে যায় গ্রীষ্মের ধূসর ক্লান্তি। গাছপালা যেন প্রাণ ফিরে পায়। মাঠ–ঘাট, খাল–বিল, ডোবা–পুকুর, নদী–নালা পানিতে ডুবে যায়। নদীতে ভেসে চলে পালতোলা নৌকা, ডিঙি আর কলাগাছের ভেলা। জলাবদ্ধতার কারণে অনেক স্থানে লোকজনের চলাচলে খুবই সমস্যা হয়।

বর্ষার ফুল : বর্ষাকালে আমাদের ঝিলে–বিলে ফোটে পদ্ম, শাপলা, কলমিসহ কত ধরনের ফুল। ডাঙায় ফোটে কদম, হিজল, কেয়া, গন্ধরাজ, বেলি ইত্যাদি। বৃষ্টির জলে ভিজে এসব ফুল সজীব হয়ে যায়। মনে হয় চারদিক জুড়ে যেন তখন ফুলের মেলা বসে।

বর্ষার ফল : বর্ষাকালে এ দেশে হরেক জাতের ফল পাওয়া যায়। এর মধ্যে উলেৰখযোগ্য হলো– জাম, পেয়ারা, আমড়া, লটকন, আতা, বাতাবি লেবু ইত্যাদি। এসব ফল বর্ষার বৈশিষ্ট্যকে স্বতন্ত্রভাবে তুলে ধরে।

বর্ষার অবদান : গ্রীষ্মের রবৰতার পর বর্ষা যেন নিয়ে আসে প্রাণের স্পন্দন। এ সময় প্রকৃতি যেন ধুয়ে–মুছে সাফ হয়ে যায়। এ সময় নদীর পানির সাথে আসা পলিমাটি জমির উর্বরতা বাড়ায়। ফলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

সাহিত্য সংস্কৃতিতে বর্ষার অবদান : বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বর্ষা গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বর্ষা যেমন প্রকৃতিকে করেছে সজীব তেমনি মানুষের মনকেও করেছে সরস। বর্ষার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে অনেক কবি–সাহিত্যিকই রচনা করেছেন গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি। প্রাচীন কবি জয়দেব থেকে শুরব করে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনেক কবি সাহিত্যিকই মুগ্ধ হয়েছেন বর্ষার সৌন্দর্যে। বর্ষা যেমন প্রকৃতিকে সিক্ত করেছে রসের ধারায় তেমনি কবিদের সিক্ত করেছে ভাবরসের ধারায়। তাই তো কবিগুরব বলেছেন–

"এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায়।"

উপসংহার : কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে বর্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঋতু। এটি রূ পবৈচিত্র্যে তুলনাহীন। ভালোবাসার উচ্চ স্পর্শে প্রকৃতির মাঝে জাগে প্রাণের স্পন্দন। অতি বৃষ্টির কারণে বন্যা হওয়ার বিষয়টি বাদ দিলে বর্ষাকাল অবশ্যই আমাদের জন্য আশীর্বাদ।

২৫ মা

অথবা, আমার মা

অথবা, আমার প্রিয় ব্যক্তিত্ব

সূচনা : 'হেরিলে মায়ের মুখ,
দূরে যায় সব দুখ।'

আমাদের সবার জীবনে 'মা' একটি মধুমাখা নাম। পৃথিবীতে তিনিই সন্তানের সবচেয়ে আপনজন। আমিও আমার মাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।

সন্তানের প্রতি মায়ের ভালোবাসা : পৃথিবীতে মায়ের কাছে সবচেয়ে দামি তাঁর সন্তান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সকল ভাবনা সন্তানদের নিয়ে। সন্তান কিসে ভালো থাকবে, নিরাপদ থাকবে– তিনি সবসময় কেবল সে ভাবনাই ভাবেন। মায়ের আশিস পেলে সন্তানের দুঃখ দূর হয়। মায়ের মমতা আমাদের চলার পথের পাথেয়।

আমার মা : আমার মা আমাকে অনেক স্নেহ করেন। সবসময় কাছে কাছে রাখেন। আমার অসুখ করলে মায়ের দুশ্চিন্তার শেষ থাকে না। রাত–দিন জেগে তিনি আমার সেবা করেন। আমার খুশির জন্য যা যা করা দরকার তার সবই মা করেন।

বন্ধু হিসেবে মা : মা আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আমি মায়ের কাছে কোনো কিছুই গোপন করি না। তিনি আমার সব ভালো কাজে উৎসাহ দেন। মন্দ কাজ করলে বুঝিয়ে বলেন। কখনোই বকুনি দেন না। মায়ের কাছেই আমার যত আবদার।

অভিভাবক হিসেবে মা : মা আমাকে মানুষের মতো মানুষ হতে বলেন। তিনি আমার সেরা শিৰক। আমার পড়া তৈরিতে মা সাহায্য করেন। কঠিন বিষয়গুলো মা খুব সহজেই বুঝিয়ে দেন।

উপসংহার : মা-ই আমার সবচেয়ে কাছের মানুষ। আমি মা-কে কষ্ট দিই না। নানা কাজে তাঁকে সাহায্য করি। সবসময় তাঁর কথামতো চলতে চেষ্টা করি।

২৬ আমার প্রিয় শিৰক

সূচনা : ছাত্রজীবনে যারা আমাদের শিৰাদানের মাধ্যমে আলোর পথ দেখান তাঁরাই আমাদের শিৰক। বিশেষ কিছু গুণের কারণে কোনো কোনো শিৰক আমাদের মনে আলাদাভাবে স্থান করে নেন। হয়ে ওঠেন আমাদের প্রিয় শিৰক, প্রিয় মানুষ। আমারও তেমনি একজন প্রিয় শিৰক আছেন।

আমার প্রিয় শিৰক : আমার সবচেয়ে প্রিয় শিৰকের নাম খন্দকার আকরাম হোসেন। স্কুলে তিনি আকরাম স্যার নামে সবার কাছে পরিচিত। তাঁর সততা, নিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্ব তাঁকে সবার কাছে অনুসরণীয় করে তুলেছে।

প্রিয় হওয়ার কারণ : আকরাম স্যার আমাদের গণিত পড়ান। গণিতে আমি খুব দুর্বল ছিলাম। গণিত পরীৰার আগের দিন ভয়ে কাঁপতাম। আকরাম স্যারের ক্লাস করার পর থেকে সে সমস্যা কেটে গেছে। এটি ছাড়াও ছাত্রদের সাথে তিনি সেভাবে খোলামন নিয়ে মেশেন সেটিও আমাকে আকৃষ্ট করে।

পাঠদান পদ্ধতি : আকরাম স্যারের পাঠদান পদ্ধতি খুবই চমৎকার। তিনি কখনই দেরি করে ক্লাসে আসেন না। খুব সুন্দরভাবে ছাত্রদের অংকগুলো বুঝিয়ে দেন। কে কতখানি বুঝতে পারল সেটিও যাচাই করেন। কেউ না বুঝলে তাকে বকা দেন না। বোঝানোর ৰেত্রে নানা ধরনের উদাহরণ ব্যবহার করেন।

চারিত্রিক গুণাবলি : আকরাম স্যার খুব নম্র ও ভদ্র মানুষ। তাঁকে কখনোই রাগতে দেখা যায় না। কাউকে কোনো কাজ দেওয়ার আগে কীভাবে করতে হবে তা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন। ছাত্রছাত্রীদের তিনি নিজের সন্তানের মতোই স্নেহ করেন। এককথায়, একজন ভালো শিৰক ও ভালো মানুষ হওয়ার জন্য যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন, তার সবই তাঁর চরিত্রে রয়েছে।

উপসংহার : আকরাম স্যারকে আমি মন থেকে অনেক শ্রদ্ধা করি ও ভালোবাসি। তাঁকে অনুসরণ করে আমি নিজেকে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

২৭ আমার প্রিয় বই

সূচনা : বই হচ্ছে জ্ঞানের ভান্ডার। বইয়ের পাতায় অনেক সুন্দর চিন্তা–ভাবনার কথা বলা থাকে। বই পড়ে আমরা স্বপ্ন দেখতে শিখি। একটি ভালো বই পাঠকের মনে স্থায়ী একটা ছাপ রেখে যায়। বারবার সে বইটি পড়তে ইচ্ছে করে। আমারও তেমনি একটি পছন্দের বই আছে।

আমার প্রিয় বই : আমার প্রিয় বইয়ের নাম 'কাকের নাম সাবানি' বইটির লেখক হচ্ছেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক।

বইয়ের কাহিনী : বইটির কাহিনী আবর্তিত হয়েছে সাবানি নামক একটি কাককে ঘিরে। সাবান খেতে ভালোবাসে বলে তার নাম সাবানি বেগম। সাবানির স্বপ্ন সে বড় একজন শিল্পী হবে। সেই লৰ্যে মফস্বলের মায়া কাটিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্য উড়াল দেয় সে। সেই ভ্রমণের বিবরণ আর সাবানির জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ বইটি।

ভালো লাগার কারণ : কিছু বই আছে যেগুলো পড়লে আনন্দ পাওয়ার পাশাপাশি অনেক কিছু শেখা যায়। 'কাকের নাম সাবানি' ঠিক তেমনই একটি বই। এ বইয়ের কাহিনীটি অসাধারণ। আর কাহিনীর ভেতরেই রয়েছে শেখার মতো অনেক উপাদান। সাবানি আর তার বন্ধু কোকিলের মধ্যকার ভালোবাসা আমাকে সত্যিকারের বন্ধুত্ব সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে। 'মধুকণ্ঠী' নামক কোকিলটি মারা গেলে সাবানি খুব দুঃখ পায়। তার কষ্টের কথা পড়ে আমারও কান্না পেয়ে গিয়েছিল। শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন সত্যি করার জন্য সাবানিকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। তার ডানা কাটা পড়েছিল, এমনকি জেলেও যেতে হয়েছিল তাকে। তারপরও প্রবল আত্মবিশ্বাসের জোরে সাবানি একসময় সফল হয়।

শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসেবে পুরস্কারও পায়। একতাবদ্ধ হওয়ার গুরবত্ব, পরোপকার, লোভ না করা ইত্যাদি অনেক কিছুই লেখক এই বইটিতে গল্পচ্ছলে উলেরখ করেছেন। গল্পে সাবানি বেগমের মজার সব কান্ডকারখানাও আমাকে প্রচন্ড আকর্ষণ করেছে। এসব কারণেই বইটি আমার এত ভালো লেগেছে।

উপসংহার : 'কাকের নাম সাবানি' বইটি একবার পড়া ধরলে শেষ না করে ওঠা যায় না। কয়েক বার পড়া হয়ে গেলেও আমার ইচ্ছা হয় বইটি আবার পড়ি। বইটি আমাকে অপরিসীম আনন্দ দিয়েছে।

২৮ ফুটবল খেলা

অথবা, আমার প্রিয় খেলা

ভূমিকা : ফুটবল অত্যন্ত চমৎকার একটি উত্তেজনাপূর্ণ খেলা। এ খেলার সূচনা হয় চীনে। বর্তমানে সারা বিশ্বে এ খেলাটি তুমুল জনপ্রিয়। আমার প্রিয় খেলাও ফুটবল।

ফুটবল মাঠের বর্ণনা : একটি সমতল মাঠে ফুটবল খেলা হয়। মাঠের চারদিক সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। লম্বালম্বি দু বিপরীত প্রান্তে দুটি গোলপোস্ট থাকে।

খেলার বর্ণনা : একটি বল মাঠের মাঝামাঝি স্থাপন করা হয়। দুটি দলের মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক দলে ১১ জন করে খেলোয়াড় থাকে। গোলপোস্ট পাহারায় থাকে একজন করে গোলরৰক। মাঝের দশ মিনিট বিরতি ছাড়া ৪৫ মিনিট করে মোট ৯০ মিনিট খেলা হয়। সময় শেষে যে দল গোল ব্যবধানে এগিয়ে থাকে তারাই জয়ী হয়।

পরিচালক : যিনি ফুটবল খেলা পরিচালনা করেন তাঁকে বলা হয় রেফারি। খেলার সকল ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তাঁর নির্দেশে খেলা আরম্ভ এবং শেষ হয়। কোনো খেলোয়াড় নিয়ম ভঙ্গ করলে রেফারি বাঁশি বাজিয়ে তাঁর নির্দেশ প্রদান করেন। মাঠের দুপাশে দুজন লাইন্সম্যান তাঁর কাজে সাহায্য করেন।

খেলার নিয়মকানুন : ফুটবল খেলার কতকগুলো নিয়ম আছে। গোলরৰক ছাড়া অন্য কেউ হাত দিয়ে বল ধরলে 'হ্যান্ড বল' ধরা হয়। বল সীমানার বাইরে চলে গেলে 'আউট' ধরা হয়। অন্যপৰের খেলোয়াড়কে অহেতুক ধাক্কা দিলে বা পা লাগিয়ে ফেলে দিলে 'ফাউল' ধরা হয়। কোনো পৰ নিজ গোলপোস্টের সীমানায় হ্যান্ডবল করলে বা প্রতিপৰের খেলোয়াড়কে ফাউল করলে 'পেনাল্টি' দেওয়া হয়। আর প্রতিপৰের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে বল যদি নিজ গোলপোস্টের পার্শ্ব সীমানার বাইরে চলে যায় তবে অপরপৰ 'কর্নার' লাভ করে। বল গোলপোস্টে প্রবেশ করলে সেটিকে গোল হিসেবে ধরা হয়।

উপকারিতা : ফুটবল খেলা বেশ আনন্দদায়ক। এ খেলা স্বাস্থ্যের পৰে উপকারী। এতে দেহের সকল অংশ উত্তমরূ পে পরিচালত হয় বলে অঙ্গা-প্রত্যঙ্গাসমূহ সবল ও দৃঢ় হয়। খেলোয়াড়দের কতগুলো নিয়মের অধীনে খেলতে হয় বলে তারা নিয়মানুবর্তিতা, কর্মতৎপরতা এবং একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার শিৰা লাভ করে।

উপসংহার : ফুটবল খুবই আনন্দময় ও উপকারী খেলা। এ খেলা খেলোয়াড় ও দর্শক উভয়ের উত্তেজনা বাড়ায়। যে কোনো বয়সী মানুষের জন্য এটি একটি ভালো ব্যায়াম। এ খেলা সহযোগিতা ও শৃঙ্খলাবোধ শিৰা দেয়। তাই ফুটবল আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলা।

২৯ আমার জীবনের লৰ্য

সূচনা : একটি সফল ও সার্থক জীবন পাওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে জীবনের লৰ্য নির্ধারণ। মানুষের জীবন ছোট কিন্তু তার কর্মৰেত্র অনেক বড়। এ ছোট জীবনে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে হলে প্রত্যেক মানুষকে জীবনের শুরবতেই সঠিক লৰ্য নির্ধারণ করতে হয়।

লৰ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা : জীবন গঠনের জন্য জীবনের একটি নির্দিষ্ট লৰ্য নির্ধারণ অত্যন্ত জরবরি। লৰ্যহীন জীবন হলো হালবিহীন নৌকার মতো। তাই লৰ্য স্থির না করলে সফলতা পাওয়া অসম্ভব। প্রতিটি মানুষকে জীবনের শুরবতে সঠিক চিন্তা ভাবনা করে লৰ্য ঠিক করে সেটাকে বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে কখনোই ব্যক্তি তার জীবনকে পরিচালনা করার সঠিক দিক পাবে না। লৰ্য না থাকলে জীবনকে উদ্দেশ্যহীন বিৰিপ্ত মনে হয়। ফলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয় না।

ছাত্রাবস্থায়ই লৰ্য স্থির করার উপযুক্ত সময় : ছাত্রজীবন পরিণত–জীবনের প্রস্তুতিপর্ব। ছাত্রাবস্থার স্বপ্ন ও কল্পনা পরিণত–জীবনে বাস্তবের মাটিতে ফুলে–ফলে সুশোভিত হয়ে সার্থক হয়। কিন্তু স্বপ্ন কেবল স্বপ্ন হলেই, কিংবা কল্পনা, অবাস্তব ও উদ্ভট হলেই চলে না; পরিণত জীবনের লৰ্যবাহী ও বাস্তবঘনিষ্ঠ হওয়া চাই। সেজন্য ছাত্রবস্থাতেই জীবনের লৰ্য স্থির করতে হয়। সে লৰ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হয়, শ্রম, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সঙ্গো।

আমার জীবনের লৰ্য : নির্দিষ্ট লৰ্য না থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায় না। লৰ্য ঠিক করে সে মোতাবেক এগিয়ে গেলেই জীবনের উদ্দেশ্য পূরণ হয়। তাই আমিও জীবনের লৰ্য ঠিক করেছি। আমার লৰ্য আর দশজনের থেকে আলাদা। আমার ইচ্ছা বড় হয়ে আমি একজন ক্রিকেটার হব।

লৰ্য নির্ধারণের কারণ : সাধারণত মানুষের জীবনের লৰ্য থাকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিৰক ইত্যাদি হওয়া। কিন্তু মানুষের যে কাজটি ভালো লাগে সেটির চর্চা অব্যাহত রাখলেই বেশি সফলতা পাওয়া যায়। ক্রিকেট খেলার প্রতি আমার ভালোলাগা অত্যন্ত প্রবল। ক্রিকেটারদের দেশপ্রেম, মনোবল ও সুশৃঙ্খল জীবন আমাকে অত্যন্ত আকর্ষণ করে। এ কারণেই আমি ক্রিকেটার হওয়ার লৰ্য ঠিক করেছি। ক্রিকেট খেললে আনন্দ লাভের পাশাপাশি শরীরকেও সুস্থ রাখা যায়। আর কঠোর নিয়ম–কানুন অনুসরণ করে খেলতে যায় বলে এ লেখা নিয়মানুবর্তিত ও সময়জ্ঞানের শিৰা দেয়। তাছাড়া বর্তমান বিশ্বে ক্রিকেট জনপ্রিয় খেলা। ক্রিকেটে বাংলাদেশেরও একটি শক্ত অবস্থান তৈরি হয়েছে। বর্তমানে এ দেশের মানুষের আশা–আকাঙ্ক্ষা ও উৎসবের অন্যতম উপলৰ হলো ক্রিকেট। তাই বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা এখন ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেই পারে।

লৰ্যপূরণে করণীয় : জীবনের লৰ্য পূরণে আমাকে এখন থেকেই মনোযোগী হতে হবে। শুধু ভালো ক্রিকেট খেললেই ভালো ক্রিকেটার হওয়া যায়। সেই সাথে পড়াশোনায়ও ভালো হওয়া

প্রয়োজন। তাহলেই ক্রিকেটের সব আধুনিক দিকগুলো ঠিকঠাক বুঝতে পারব। এখন থেকেই ক্রিকেটের সব খুঁটিনাটির বিষয়ে আমাকে জানতে হবে। নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে।

উপসংহার : বিখ্যাত কোনো ক্রিকেটার হতে পারলে পৃথিবীর বুকে দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে। বিশ্বের অনেকেই এখন বড় ক্রিকেটার হতে চায়। বাংলাদেশও ক্রিকেটে এখন ভালো অবস্থানে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ক্রিকেট অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। একজন আদর্শ ক্রিকেটার হয়ে আমি সে সম্ভাবনাকে সত্যে পরিণত করতে চাই। দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনতে চাই।

৩০ ছাত্রজীবন

অথবা, ছাত্রজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

[ঢা.বো., য.বো., রা.বো., চ.বো. ১৫]

সূচনা : বিদ্যাশিৰার জন্য শিশুকাল থেকে শুরব করে যে সময়টুকু আমরা শিৰা প্রতিষ্ঠানে অতিবাহিত করি তাকেই ছাত্রজীবন বলে। ছাত্রজীবন হচ্ছে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়। ভবিষ্যত জীবনের সফলতার জন্য এ সময় থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়।

ছাত্রজীবনের গুরবত্ব : ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ, সমৃদ্ধি ও উন্নতির বীজ ছাত্রজীবনেই বপন করতে হয়। ছাত্রজীবনের সুশিৰাই ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়। আমাদের জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাত্রজীবনের সাধনার ওপর সম্পূর্ণরূ পে নির্ভরশীল।

ছাত্রজীবনের কর্তব্য : অধ্যয়ন করাই ছাত্রজীবনের প্রথম ও প্রধান তপস্যা। ছাত্রসমাজই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। এজন্য ছাত্রদের অন্যতম কাজ হলো শিৰা-দীৰায় সমৃদ্ধ ও আদর্শ জীবন গঠন করা। ছাত্রসমাজকে জ্ঞান–বিজ্ঞানে উন্নত এবং শারীরিক শক্তিতে ও মানসিক দৰতায় বলীয়ান হতে হবে। যোগ্যতাসম্পন্ন ও চরিত্রবান ছাত্রদের জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

লৰ্য নির্ধারণ : লৰ্যহীন জীবন হালবিহীন জাহাজের মতো। ছাত্রজীবনেই জীবনের লৰ্য স্থির করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হবে।

চরিত্র গঠন : চরিত্র মানবজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। ছাত্রজীবনই চরিত্র গঠনের উপযুক্ত সময়। ছাত্রদের চরিত্র গঠনে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। সৎ পথে চলা, সত্য কথা বলা, লোভ-লালসা থেকে বিরত থাকা, খারাপ কাজ ও কুসঙ্গ থেকে দূরে থাকা, ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের শ্রদ্ধা করা ইত্যাদি ভালো গুণগুলো ছাত্রজীবনেই চর্চা করতে হবে।

খেলাধুলা ও স্বাস্থ্য গঠন : পড়াশোনার পাশাপাশি শরীর গঠনের প্রতিও ছাত্রদের মনোযোগী হতে হবে। স্বাস্থ্য মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ। সুস্থ শরীরেই সুস্থ মনের বাস। তাই ছাত্রজীবনে নিয়মিত খেলাধুলার মাধ্যমে স্বাস্থ্য গঠনে সচেস্ট হতে হবে।

সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ : ছাত্রদের মানসিক বিকাশে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়া অত্যন্ত জরবরি।এৰেত্রে যার যে কাজ ভালো লাগে সে কাজে মনোযোগ দিতে হবে। বিতর্ক চর্চা, আবৃত্তি চর্চা, বই পড়া, ভ্রমণ, ছবি তোলা, বিজ্ঞান চর্চা, লেখালেখি ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে আরও তীক্ষ্ণ করে তোলা সম্ভব।

জনসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ : ছাত্ররাই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। তাই ছাত্রজীবনে সকলের উচিত জনসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ৰতিগ্রস্থদের সাহায্য–সহযোগিতায় এগিয়ে আসা ছাত্রদের কর্তব্য।

উপসংহার : ছাত্রজীবনই জীবনের সবেচেয় গুরবত্বপূর্ণ সময়। তাই এ সময় থেকেই ছাত্রদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে হবে। ছাত্ররাই ভবিষ্যতে দেশের সকল ৰেত্রে নেতৃত্ব দিবে। তাই নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারলেই দেশ ও জাতির জন্য তারা গৌরব বয়ে আনতে সৰম হবে।

৩১ মানুষের বন্ধু গাছপালা

অথবা, বৃৰরোপণ অভিযান

অথবা, গাছ লাগান-পরিবেশ বাঁচান

সূচনা : বৃৰ বা গাছপালা মানুষের অকৃত্রিম ও চিরস্থায়ী বন্ধু। মানবজাতির সামগ্রিক কল্যাণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রৰায় বৃৰের অবদান অসামান্য। এ ব্যাপারে সমগ্র বিশ্বই আজ সচেতন। বৃৰরোপণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আমাদের দেশেও সেৱাগান উঠেছে, 'গাছ লাগান–পরিবেশ বাঁচান'।

বৃৰের প্রয়োজনীয়তা : বিশ্বের বনভূমি উজাড় হতে হতে অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে বিশ্ব–পরিবেশ হুমকির মুখে পড়েছে। অথচ মানুষের বসবাসের উপযোগী ভারসাম্যপূর্ণ পৃথিবীর জন্যে গাছপালার কোনো বিকল্প নেই। অক্সিজেন দিয়ে গাছপালা কেবল আমাদের জীবন রৰা করে না, প্রাকৃতিক ভারসাম্য রৰায় বৃৰ পালন করে অনিবার্য ভূমিকা। প্রস্বেদন প্রক্রিয়া ও বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বৃৰ আবহাওয়া মণ্ডলকে বিশুদ্ধ রাখে, জলীয় বাষ্প তৈরি করে বাতাসের আর্দ্রতা বাড়িয়ে বায়ুমণ্ডলকে রাখে শীতল। বৃৰ বৃষ্টি ঝরিয়ে ভূমিতে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে, বাড়িয়ে দেয় মাটির জলধারণ ৰমতা। তাই বৃৰকে গণ্য করা হয় বায়ুমণ্ডলের বিশুদ্ধকরণ ও শীতলীভবনের অন্যতম অনুঘটক হিসেবে। এ ছাড়াও গাছপালা মাটির উর্বরতা বাড়ায়, মাটির ৰয় রোধ করে। ঝড়–ঝঞ্ঝা–বন্যা রোধেও পালন করে সহায়ক ভূমিকা। নদী ছাপিয়ে আসা বন্যার তোড়তে ঠেকায় বনভূমি। মাটির ওপর শীতল ছায়া বিছিয়ে দিয়ে ঠেকায় মরবকরণের প্রক্রিয়াকে।

বাংলাদেশে বৃৰনিধন ও তার প্রতিক্রিয়া : ভারসাম্যমূলক প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্যে দেশের মোট ভূমির অন্তত ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। সেৰেত্রে সরকারি হিসেবে বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ ১৭ শতাংশ। উপরন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে ঐ বনভূমির পরিমাণও হ্রাস পাচ্ছে। যেখানে তিনটি গাছ কাটা হচ্ছে সেখানে একটি গাছও লাগানো হচ্ছে কিনা সন্দেহ আছে। ফলে বাস্তবে বনভূমি বাড়ছে না। দুঃখের বিষয়, গত একশ বছরে প্রাকৃতিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের বনাঞ্চল উজাড় হয়ে গেছে। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে ব্যাপক হারে নির্বিকার বৃৰনিধনের ঘটনা ঘটেছে। ফলে দেশের উত্তর ও উত্তর–পশ্চিমাঞ্চলের বনভূমির পরিমাণ নেমে এসেছে ৩.৫ শতাংশে। তারই বিরূ প প্রতিক্রিয়া পড়েছে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর আবহাওয়ায়। দিনের বেলা দুঃসহ গরম আর রাতে

প্রচণ্ড শীত অনুভূত হচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে, এ লবণ মরবকরণ প্রক্রিয়ার আশঙ্কাজনক পূর্বাভাস।

বৃৰরোপণ অভিযান : দেশকে মানুষের বসবাস উপযোগী করার জন্য বনায়নের বিকল্প নেই। কেননা গাছপালাই পরিবেশের ভারসাম্য রৰা করে। কিন্তু গাছ না লাগিয়ে যদি কেবল কেটে ফেলা হয় তাহলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে এবং পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। এজন্য বৃৰরোপণে সমাজের সকল স্তরের লোকজনকে উৎসাহিত করতে হবে। বাংলাদেশের বনায়নের সম্ভাবনা বিপুল। নানাভাবে এ বনায়ন সম্ভব। একটি পন্থা হলো সামাজিক বন উন্নয়ন কর্মসূচি। এর লৰ্য হলো : রাস্তার পাশে বৃৰরোপণে জনসাধারণকে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করানো। জনগণ যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কর্মসূচিতে যোগ দেয় সেজন্যে অর্থনৈতিক প্রণোদনা থাকতে হবে। তাছাড়া নানা জাতের বৃৰ মিশ্রণ করে রোপণ করতে হবে যেন গ্রামবাসীরা খাদ্য, ফল, জ্বালানি ইত্যাদি আহরণ করতে পারে। সাধারণ জনগণকে যদি বিপন্ন পরিবেশের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করা যায় তাহলে অনেকেই বৃৰরোপণের কাজে এগিয়ে আসবেন।

আমাদের করণীয় : বৃৰরোপণ অভিযান সফল করার জন্য সরকারের পাশাপাশি জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে। বাড়ির আশপাশে খালি জায়গাগুলোতে যথাসাধ্য গাছ লাগাতে হবে। বড়দের পাশাপাশি শিশুদের এ ব্যাপারে এখন থেকেই সচেতন করে তুলতে হবে। একটি গাছ কাটার প্রয়োজন হলে আগে কমপৰে দুটি গাছ লাগাতে হবে।

উপসংহার : মানুষ ও প্রাণিকুলের সুরৰিত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য বৃৰরোপণ অভিযান অত্যন্ত জরৰরি। এ অভিযান সফল হলে আমাদের জীবন সমৃদ্ধ হবে। দেশ ভরে উঠবে সবুজের প্রশান্তিতে।

৩২ বিজ্ঞানের অবদান

অথবা, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

সূচনা : বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। আজ বিজ্ঞান আমাদের কাছে নিশ্বাস–প্রশ্বাসের মতোই অপরিহার্য। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একটা মুহূর্তও বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া আমরা চলতে পারি না। এখন যে–কোনো ধরনের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষই বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত যাবতীয় কাজকর্মের মধ্যে বিজ্ঞানের অবদান লৰণীয়। বলা যায়, এখন বিজ্ঞানই মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের নিয়ন্ত্রক।

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান : বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে মানুষের একটি মুহূর্তও কল্পনা করা যায় না। এখন প্রতি মুহূর্তে, প্রতি পদৰেপে সভ্য–মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে জীবন-ধারণ করছে। এই যে বসে লিখছি– হাতের কলম ও কালি, লেখার কাগজ, এমনকি বসার জায়গাটিতে পর্যন্ত বিজ্ঞানের প্রভাব রয়েছে। আমাদের পথে–ঘাটে, অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে সব জায়গায়ই বিজ্ঞানের অবদান অসীম। শুধু তাই নয়, আমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের এই প্রাথমিক প্রয়োজনটুকুও বিজ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রতিটি কাজেই আমরা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল।

শহুরে জীবনে বিজ্ঞান : শহুরে জীবনে মানুষ আর বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শহরে আমাদের ঘুম ভাঙে এলার্মঘড়ির শব্দে। ঘুম থেকে উঠে দিনের শুরু করি টুথপেস্ট আর টুথব্রাশ দিয়ে। এরপর আছে সংবাদপত্র। তারপর গ্যাস অথবা হিটার কিংবা স্টোভে তাড়াতাড়ি রান্না করে খাই। রিক্সা, অটোরিক্সা, বাস, ট্রেন বা মোটরসাইকেলে চড়ে কর্মস্থলে পৌছাই। সিঁড়ির বদলে লিফটে উঠে শ্রেণিকৰে বা অফিসকৰে যাই। টেলিফোন, টেলিগ্রাম, ফ্যাক্স, ই–মেইল, ইন্টারনেট ইত্যাদির সাহায্যে দূর–দূরান্তে খবর পাঠাই। কম্পিউটারে কাজের বিষয় লিখে রাখি। ক্লান্ত দেহটাকে আরাম দেওয়ার জন্য এসি কিংবা ইলেকট্রিক পাখার নিচে বসি– এই ভাবেই সারাদিন বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জীবন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দিনের অবসন্নতা দূর করতে মিউজিক পেরয়ার কিংবা টিভি চালিয়ে মনটাকে সতেজ রাখতে চেষ্টা করি। ছেলে–মেয়েরা কম্পিউটারে তাদের নোট রাখে; কখনো কখনো ভিডিও গেমস্ খেলে। এমনিভাবে জীবনের প্রতি পদৰেপেই বিজ্ঞানের অবদান অনুভব করি।

গ্রামীণ জীবনে বিজ্ঞান : যোগাযোগ ও যাতায়াতের ৰেত্রে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অবদানের জন্য মানুষ আজ দূরকে করেছে নিকট প্রতিবেশী। বাস, রিক্সা, ভ্যান, সাইকেল, মোটরসাইকেল সবই এখন গ্রামীণ জীবনের অংশ। ফলে বিজ্ঞান শহরজীবনকে অতিক্রম করে পৌঁছে গেছে গ্রামে। বর্তমানে গ্রাম্য জীবনেও বিজ্ঞানের উপর নির্ভরতা বেড়েই চলেছে। টিভি, রেডিও, মোবাইল ফোন, টর্চ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক দ্রব্য, ট্রাক্টর ইত্যাদি এখন গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। শহরের মানুষ যেমন নিজেদের জীবনযাত্রাকে সহজ করতে বিজ্ঞানকে নিত্যসঙ্গী করেছে, তেমনি গ্রামের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত মানুষের জীবনেও ইলেকট্রিক হিটার, রান্নার গ্যাস, প্রেসার কুকার, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাবের অপকারিতা : দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা মানুষের অনেক ৰতি করেছে। যন্ত্রের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করতে গিয়ে মানুষ পরিশ্রম–বিমুখ হয়ে উঠছে। মানসিক পরিশ্রমের তুলনায় শারীরিক পরিশ্রম কম করছে। ফলে মানুষ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, মানুষের জীবনে কৃত্রিমতা ঘনীভূত হচ্ছে। মানুষের স্নেহ, মায়া, মমতার মতো সদগুণগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষে মানুষে বিভেদ বাড়ছে। বিজ্ঞান–নির্ভর যন্ত্রশক্তির উপর অন্ধ আস্থা স্থাপন করতে গিয়ে মানুষ যান্ত্রিক হয়ে উঠছে।

উপসংহার : আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনীয় বস্তু আজ একেবারে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে বিজ্ঞান। সকাল থেকে সন্ধ্যা, আবার সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত যা কিছু আমাদের প্রয়োজনীয় তার সবই বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞান আজ আমাদের নিত্য সহচর। বিজ্ঞান আমাদের জীবন–যাপনকে করেছে সহজসরল। তবে দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব শুধু যে কল্যাণ

করছে তা নয়, অনেক ৰতিও করছে। তাই বিজ্ঞানের অপব্যবহার না করে আমাদের আরো সচেতন হতে হবে।

৩৩ কম্পিউটার

অথবা, কম্পিউটার: বিজ্ঞানের বিস্ময়

সূচনা : যুগে যুগে বিজ্ঞানের কল্যাণে অনেক অভাবনীয় প্রযুক্তির সাথে মানুষের পরিচয় ঘটেছে। সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো কম্পিউটার। কম্পিউটারের শাব্দিক অর্থ হিসাবকারী যন্ত্র। তবে কেবল যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ প্রভৃতির মধ্যেই এর কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ নয়। বিজ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ থেকে শুরব করে নিতান্ত সাধারণ মানুষের জীবনে কম্পিউটার আজ একটি প্রয়োজনীয় জিনিসে পরিণত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে একক আবিষ্কার হিসেবে কম্পিউটার মানবজীবনকে যতটা প্রভাবিত করেছে, তা বোধ হয় অন্য কিছু পারেনি। কম্পিউটারে অনেক ৰেত্রে মানুষের মস্তিষ্কের অনুকরণ করা হয়েছে। তবে কাজের দ্রবততা, বিশুদ্ধতা এবং নির্ভরশীলতার দিক থেকে কম্পিউটার মানুষের চেয়ে অনেক উন্নত। আধুনিক জীবনের প্রতিটি ৰেত্রই কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণাধীন। বিচিত্র ও বহুমুখী সব কাজে কম্পিউটারের ব্যবহার জীবনকে সহজ করে তুলেছে বহুগুণে।

উদ্ভাবন : কম্পিউটার উদ্ভব ও বিকাশের পেছনে বহু শতাব্দীর সাধনা বিদ্যমান। মানুষের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফল এই কম্পিউটার। যোগ-বিয়োগ করতে সৰম গণনাযন্ত্র প্রথম তৈরি করেন গণিতবিদ বেরইজ প্যাসকেল ১৬৪২ সালে। ১৬৭১ সালে গটফ্রাইড লেবনিট্জ প্রথম গুণ ও ভাগের ৰমতা সম্পন্ন যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর তৈরি করেন। আধুনিক কম্পিউটার উদ্ভাবনের সূত্রপাত হয় ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ গণিতবিদ চালর্স ব্যাবেজের গণকযন্ত্র অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন থেকে। চার্লস ব্যাবেজকে তাই কম্পিউারের জনক বলা হয়। প্রথমদিকের কম্পিউটারগুলো আকার ও আয়তনে ছিল বিশাল। কয়েকটি রবমে রাখতে হতো এর যন্ত্রপাতি। পরবর্তীকালে মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কার হওয়ায় এর আকার ছোট হয়ে আসে। বর্তমানে হাতের তালুর আকারের কম্পিউটারও বাজারে পাওয়া যায়।

গঠন : একটি কম্পিউটারে অনেক ধরনের যন্ত্রাংশ থাকলেও এর গঠনরীতির প্রধান দুটি দিক লৰ করা যায়। একটি হলো যান্ত্রিক সরঞ্জাম বা হার্ডওয়্যার অন্যটি পোগ্রাম সম্পর্কিত বা সফটওয়্যার। হার্ডওয়্যারের মধ্যে পড়ে তথ্য সংরৰণের স্মৃতি, অভ্যন্তরীণ কার্যের জন্য ব্যবহৃত তাত্ত্বিক দিক, তথ্য সংগ্রহের কাজে ইনপুট অংশ, ফলাফল প্রদর্শনের জন্য আউটপুট অংশ এবং সকল বৈদ্যুতিক বর্তনী। এসব যান্ত্রিক সরঞ্জামের কাজ হলো প্রোগ্রামের সাহায্যে কম্পিউটারকে কর্মৰম করে তোলা।

প্রকারভেদ : কম্পিউটারের ভিতরের গঠন আকৃতি, কাজের গতি ইত্যাদি বিচারে এটাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো : ১. সুপার কম্পিউটার, ২. মেইন ফ্রেম কম্পিউটার, ৩. মিনি কম্পিউটার ও ৪. মাইক্রো কম্পিউটার। গঠন ও আকৃতিগত পার্থক্য থাকলেও এদের মূলনীতিতে বিশেষ পার্থক্য নেই বললেই চলে।

উপকারিতা : বাস্তবিক অর্থে কম্পিউটার পারে না এমন কোনো কাজ নেই। ঘরবাড়ি, অফিস, কলকারখানা সব জায়গাতেই অনেক বড় বড় কাজ নিমেষেই কম্পিউটারে করে নেওয়া যাচ্ছে। এতে অনেক দৈহিক ও মানসিক শ্রম সাশ্রয় হচ্ছে। চিকিৎসাৰেত্রে কম্পিউটার আশীর্বাদরূ পে আবির্ভূত হয়েছে। অনেক সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার, রোগ নির্ণয় ইত্যাদিতে এর ব্যবহার করা হচ্ছে। নকশা করা, গণনা করা, ছবি আঁকা, লেখা, পড়া, বিনোদন- এককথায় জীবন যাপনের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি কাজেই কম্পিউটার আমাদের নিত্যসঙ্গী। কম্পিউটারে ইটারনেট ব্যাবহার করে মুহূর্তের মধ্যেই আমরা বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারছি। এভাবে কম্পিউটার পুরো বিশ্বটাকেই আমাদের হাতের মুঠোয় বন্দি করেছে।

কম্পিউটারের ৰতিকর দিক : কম্পিউটারের অসংখ্য উপকারি দিকের পাশাপাশি কিছু ৰতিকর দিকও রয়েছে। এক কম্পিউটার একই সাথে অনেক মানুষের কাজ করে দেওয়ায় বেকারত্ব বাড়ছে। তাছাড়া অনেকে কম্পিউটারে কাজের বদলে গেমস খেলে বা অপ্রয়োজনীয় কাজ করে সময় নষ্ট করে। এটি শিশুদেরকে শারীরিক পরিশ্রম ও খেলাধুলা থেকে বিমুখ করছে।

কম্পিউটার ও বাংলাদেশ : যুগের চাহিদার পরিপ্রেৰিতে বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটার একটি অগ্রগণ্য খাত। বাংলাদেশেও কম্পিউটারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যে কারণে পাঠ্যসূচিতে কম্পিউটারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কম্পিউটার ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সরকার এর যন্ত্রাংশ আমদানির ৰেত্রে ন্যূনতম শুল্ক ধার্য করেছে। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি স্কুল কলেজে কম্পিউটার শিৰা বিভাগ খোলার পরিকল্পনা সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। তাছাড়া কম্পিউটার বিষয়ে উচ্চতর শিৰা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগ খোলাসহ আলাদাভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। কম্পিউটারকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে বিপুল কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ব্রিটেনসহ উন্নত দেশসমূহে দৰ কম্পিউটার প্রকৌশলীর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আমেরিকায় সিলিকন ভ্যালিতে প্রচুর বাংলাদেশি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সাফল্যের সাথে কাজ করছেন। বাংলাদেশে কম্পিউটারের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হওয়ায় বিরাট বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের সফটওয়্যার শিল্প বিদেশে বাজার দখল করতে শুরব করেছে।

উপসংহার : কিছু নেতিবাচক দিক থাকলেও আধুনিক জীবনে কম্পিউটারের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য কম্পিউটার প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের দিকে বিশেষভাবে মনযোগী হতে হবে। আমাদের তরবণ প্রজন্মকে কম্পিউটার শিৰায় শিৰিত করে তুলতে হবে। তথ্য প্রযুক্তিকে উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যবহার করলে খুব দ্রবতই আমরা সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারব।

৩৪ চরিত্র

ভূমিকা : চরিত্রের ওপর নির্ভর করে মানুষের ব্যক্তিত্ব। ভালো চরিত্রের মাধ্যমে মানুষ সব গুণের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে।

ফলে চরিত্র ভালো হলে সেই ব্যক্তি সকলের কাছে আদরণীয় হয়ে ওঠে। কোনো ব্যক্তির আচরণ ও আদর্শের উৎকর্ষবাচক গুণ বোঝাতে চরিত্র শব্দটি ব্যবহৃত হয়। উত্তম চরিত্র মানুষকে ন্যায়পথে, সৎপথে পরিচালিত করে। এই চরিত্রের মধ্যেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় নিহিত। চরিত্র ভালো হলে মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে। আবার চরিত্র খারাপ হলে মানুষ তাকে ঘৃণা করে। চরিত্র অনুযায়ীই গঠিত হয় ব্যক্তিজীবন, যার প্রভাব পড়ে পরিবেশ ও সমাজের ওপর।

চরিত্রের ধারণা : মানুষের সামগ্রিক জীবনের কাজ–কর্মে, চিন্তা–ভাবনায়, ওঠা–বসা, আচার–আচরণে প্রকাশিত ভাবকেই চরিত্র বলে। গুরবজনের প্রতি ভক্তি, ন্যায়পরায়ণতা, আত্মসংযম ইত্যাদি নানা উৎকর্ষবাচক গুণের মাধ্যমে সচ্চরিত্রের প্রকাশ পায়। অন্যদিকে মানুষের মধ্যে লুক্কায়িত অপকর্ম বা পশুত্ব চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলে তার মধ্যে দুশ্চরিত্রের ভাব প্রকাশ পায়।

চরিত্র গঠনের উপায় : সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সূত্র ধরেই শিশুর চরিত্র গঠিত হয়। মাতা–পিতা, আত্মীয়–স্বজন থেকে শুরব করে পাড়া–প্রতিবেশীর পরিবেশের মধ্য দিয়েও চরিত্র গঠিত হয়। শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসতে শুরব করে এবং সমবয়সীদের সঙ্গে খেলাধুলা করে তখনই তার চরিত্রের রূ প বিকশিত হতে থাকে। সেজন্য এ অবস্থায় অভিভাবক এবং শিৰকদের বিশেষভাবে লৰ রাখা উচিত, এছাড়া পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানব চরিত্রের ৰেত্রে একটা গুরবত্বপূর্ণ ব্যাপার। সে যেরূ প পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করে, সাধারণত তার চরিত্র সেভাবেই গঠিত হয়।

চরিত্র গঠনে পারিবারিক পরিবেশ : চরিত্র গঠনে পারিবারিক পরিবেশ গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুকাল ও শৈশবকালই হচ্ছে চরিত্র গঠনের উৎকৃষ্ট সময়। তাই বাসগৃহকে চরিত্র গঠনের উপযুক্ত স্থান হিসেবে মনে করা হয়। শিশুকে সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহিত করা হলে তাতে সৃজনী প্রতিভা বিকশিত হয়। শিশুরা স্বভাবতই অনুকরণপ্রিয়। তাই শৈশবে শিশুর কোমল হৃদয়ে যা প্রবিষ্ট হয় তা চিরস্থায়ী রূ প পরিগ্রহ করে। এজন্য শিশুর পরিবার যদি সৎ ও আদর্শবান হয় তাবে শিশুও সৎ ও আদর্শবান হতে বাধ্য। শিশুর জীবনে মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটাতে হলে চাই সৎ সঙ্গ। আজকাল শিশুর ভালো–মন্দ চরিত্র গঠনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখছে টেলিভিশন ও স্যাটেলাইট চ্যানেলের মতো গণমাধ্যমে। স্যাটেলাইটের বিভিন্ন চ্যানেলে যেসব অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় তার মধ্যে এমন অনেক অনুষ্ঠান রয়েছে যা শিশুদের জন্য অনুপযোগী। তাই অভিভাবককে এদিকে লৰ রাখতে হবে। এভাবে পারিবারিক পরিবেশ শিশুর চরিত্র গঠনে প্রত্যৰ ভূমিকা রাখে।

চরিত্র গঠনে নিজের ভূমিকা : চরিত্র গঠনে ব্যক্তির নিজস্ব সাধনা ভূমিকা রাখতে পারে। বহুদিনের সাধনার ফলে মানুষ সচ্চরিত্রবান হয়ে উঠতে পারে। সাধনার মাধ্যমে সচ্চরিত্রবান হতে নিজেকে প্রত্যয়ী হতে হবে। বাস্তবজীবনে মানুষ নানা প্রয়োজনে তাড়িত হয়। কিন্তু প্রলোভনে পড়লে মানুষ তার অমূল্য সম্পদ চরিত্রকে হারাতে পারে। তাই চরিত্রকে মজবুত করতে হলে নিজেকে সকল প্রলোভনের ঊর্ধ্বে রাখতে হবে। দৃঢ় মনোবল নিয়ে তাকে সকল লোভ মোহ ত্যাগ করে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলে সে সচ্চরিত্র গঠনে সফল হবে বলে আশা করা যায়।

চরিত্র গঠনে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও সঙ্গীদের প্রভাব : মানবচরিত্র গঠনে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের গুরবত্ব অপরিসীম। ব্যক্তি যেরূ প পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাস করে, সাধারণত তার চরিত্র সেভাবেই গঠিত হয়। সেজন্য সে যাতে পরিবারের বাইরে কুসংসর্গে মিশতে না পারে অথবা কুকার্যে লিপ্ত হতে না পারে, সেদিকেও অভিভাবকদের লৰ রাখা উচিত। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের ৰেত্রে তাকে অন্যের সান্নিধ্য গ্রহণ করতে হয়, বন্ধু নির্বাচন করতে হয়। সৎ চরিত্রের প্রভাবে মানুষের পশুপ্রবৃত্তি ঘুচে যায়, জন্ম নেয় সৎ, সুন্দর ও মহৎ জীবনের আকাঙ্ক্ষা। আবার সঙ্গদোষে মানুষ কুসংসর্গে পড়ে নিজের অজ্ঞাতে পাপের পথে পরিচালিত হয়। তাই সঙ্গ নির্বাচনে আমাদের সতর্ক হতে হবে।

মহৎ চরিত্রের দৃষ্টান্ত : পৃথিবীতে যারা স্বীয় কর্মবলে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁরা সবাই ছিলেন চরিত্রবান ও আদর্শ মানব। আদর্শ মহাপুরবষ হযরত মুহম্মদ (সা.), মহামানব হযরত ঈসা (আ.) বা আধুনিককালের ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হাজী মুহম্মদ মুহসীন, জগদীশ চন্দ্র বসু, শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মহাপুরবষ চরিত্রবলেই জগতে অসাধ্য কর্মকে সহজতর করেছেন, অসম্ভবকে সম্ভবপর করেছেন। তাই প্রত্যেক চরিত্রবান ব্যক্তির চরিত্রে একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। তাঁদের অনমনীয় সেই ব্যক্তিত্ব দিয়ে তারা চারপাশের বিপন্ন পরিবেশকে সুস্থ করেছেন।

সমাজে চরিত্রবান ব্যক্তির অবস্থান : চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অধম। স্বাস্থ্য, অর্থ এবং বিদ্যাকে আমরা মানবজীবনের অপরিহার্য উপাদান বিবেচনা করি। কিন্তু জীবনৰেত্রে এগুলোর যতই অবদান থাকুক না কেন, এককভাবে এগুলোর কোনোটিই মানুষকে সর্বোত্তম মানুষে পরিণত করতে সৰম নয়। কারণ, সমৃদ্ধিময় জীবনের জন্য চরিত্র প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তি চরিত্রবান না হলে সকলে তাকে অত্যন্ত নীচু মানসিকতার লোক মনে করে।

চরিত্র গঠনের গুরবত্ব : প্রকৃত মানুষ হতে হলে অনেক সাধনা করতে হয়। তাই এ সাধনা বা প্রয়াসের প্রথম পদৰেপ হলো তার চরিত্র গঠনের সাধনা। চরিত্র গঠনের গুরবত্ব এতই ব্যাপক যে, জীবনের যাবতীয় সফলতার পূর্বশর্ত হিসেবেই একে বিবেচনা করা যায়। ব্যক্তিগত জীবনে সুখী, সফল, আত্মপ্রত্যয়ী এবং জয়ী হওয়ার জন্য চরিত্রের প্রয়োজন। সামাজিক জীবনে প্রভাবশালী এবং বরণীয় হওয়ার জন্য ভালো চরিত্রের প্রয়োজন। ভালো চরিত্রের প্রয়োজন আন্তর্জাতিক জীবনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য।

উপসংহার : সমাজে ভালো চরিত্রের অবস্থান অনেক ওপরে। প্রাচুর্যের বিনিময়ে সেই চরিত্রকে কেনা যায় না। ধনসম্পত্তির অভাবে মানুষ অতৃপ্ত থাকতে পারে, কিন্তু যার চরিত্র প্রকৃত অর্থে সচ্চরিত্রের গুণ লাভ করেছে সে চিরপূর্ণ ও চিরতৃপ্ত মানুষ। নশ্বর এই পৃথিবীতে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির সার্থকতা রয়েছে চরিত্রবান মানুষের ভালো কাজের মধ্যে। চরিত্র মাধুর্য মানুষকে অনন্যতা দান করে। চরিত্রবান ব্যক্তি সমাজের শ্রেষ্ঠ অলংকার। মানবজীবনে চরিত্রের মতো বড় অলংকার আর নেই। তাই আমাদের সকলকেই চরিত্রবান হওয়ার সাধনা করতে হবে।

৩৫ সততা

ভূমিকা : সততাই শ্রেষ্ঠ নীতি। মানব চরিত্রের অন্যতম একটি মহৎ গুণ হলো সততা। এই গুণ অর্জনের চেষ্টা ও চর্চা একজন মানুষকে

পৌঁছে দিতে পারে মর্যাদা ও গৌরবের শ্রেষ্ঠতম শিখরে। নিষ্ঠার সঙ্গে নিরলস অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তি তার নৈতিক উৎকর্ষতা বাড়িয়ে এই গুণ অর্জন করতে পারে। সততার গুণ না থাকলে কেউ আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সততাই মানব চরিত্রের অলংকার এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

সততা কী : মানবচরিত্রে অনেক সদগুণের সমষ্টিই সততা। সত্যের অনুসারী মানুষের সৎ থাকার প্রবণতার মধ্য দিয়ে সততার প্রকাশ ঘটে। অন্যায়, অবৈধ কাজ না করে ন্যায় ও সত্যের পথে জীবন পরিচালনা করাই সততার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সৎ চিন্তা ও সৎ কাজের মধ্য দিয়েই সততার মহৎ গুণের বিকাশ ঘটে। যারা পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়তে চায় সেই সব মানুষ সততার চর্চা করে সমাজে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে।

সততার সুফল : সততার সুফল শতদলের মতো শত ধারায় বিকশিত। জীবনকে সুন্দর, সফল ও সার্থক করে তুলতে হলে সততার বিকল্প নেই। সৎ গুণসম্পন্ন মানুষ কখনও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকতে পারে না। সততার অলংকার ছাড়া কোনো মানুষ চরিত্রবান ও মহৎ হতে পারে না। সততার আলোকরশ্মি দেশ সমাজে ছড়িয়ে পড়লে সমাজ থেকে অন্যায়ের কুৎসিত অন্ধকার দূর হয়। সৎ লোক সমাজে সবার বিশ্বাসভাজন হয়ে থাকেন। যে সমাজে এমন বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা যত বেশি সেই সমাজ তত সমৃদ্ধ। সমাজের নেতৃত্ব সততার গুণে গুণান্বিত লোকদের হাতে থাকলে মানুষের জান, মাল, মান, সম্পদ নিরাপদ থাকে। তাই মানুষ চায় তাদের নেতা সৎ, সাহসী ও যোগ্য হোক।

মানুষের নৈতিক উন্নতি এবং মুক্তির বাণী নিয়ে পৃথিবীতে যত ধর্ম এসেছে তার সবগুলোতেই সততা, সত্যবাদিতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ধর্মের মূল কথাই হলো সততা।

সততার প্রভাব : সত্য হলো আলো আর মিথ্যা অন্ধকার। সত্যের আলোর প্রভাবে মিথ্যা দূর হয়। মিথ্যার সাথে জড়িয়ে থাকা পাপও দুর্বল হয়ে পালানোর পথ খুঁজতে থাকে। সততার প্রভাব উপলব্ধি করার জন্য সত্যসাধক হতে হবে। কারণ এর জ্যোতির্ময়তা অজ্ঞ লোকদের চোখে ধরা পড়ে না। কারণ তারা চোখ থাকতেও অন্ধ। তাদেরকে এর জন্য চরম মূল্য দিতে হয়। কিন্তু এর বিপরীতে একজন সৎ লোকের সততার আলো শুধু তাকে নয়, তার সংস্পর্শে আসা অন্যরাও উপকৃত হয়।

সৎ লোকের সততার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে অসৎ-মন্দলোক ও জীবনের গতি বদলে যায়।

সত্যের অনুসারী ব্যক্তির চিন্তায়, বিশ্বাসে ও প্রকাশে যে অভিব্যক্তি সেই সততাই মানবজীবনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চারিত্রিক দিক। এটি দুটি মানবীয় গুণ যাদের মূল্যবোধে ছড়িয়ে আছে, তারা কেবল মানুষ-ই নয়, বলা যায় মহামানুষ। বিশ্বাসের দৃঢ়তায় তারা বলিষ্ঠ, জগতে তাদেরই জয়-জয়কার। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, 'আমার জীবনের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করতে পেরেছি যে একমাত্র সততা ও ভালোবাসা দ্বারা পৃথিবীকে জয় করা যায়।'

মহৎ মানুষের জীবন সততার দৃষ্টান্ত : মহামানবগণ সত্যের অনুসরণে তাঁদের জীবনের মহান সাধনাকে সফল করেছেন। মহৎ ও বরণীয় মানুষ মাত্রই সততার মূর্ত প্রতীক। সত্যবাদিতার জন্য যেমন তাঁরা লৰ্য অর্জনে সাফল্যলাভ করেছেন, তেমনি সত্যের বলে বলীয়ান হয়ে তাঁরা প্রবল শত্রৰকেও পরাজিত করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করেছেন। সর্বকালের মহামানব, মহাপুরৰষ, মানব মুক্তির অগ্রদূত হযরত মুহম্মদ (সা.) সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সমস্ত জীবন নানা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে কঠোর সাধনা মগ্ন ছিলেন। সত্যের সাধনার বলেই তিনি সবার কাছে আল-আমিন বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত হন। সত্যের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন যিশুখ্রিস্ট। সত্যকে সমুন্নত রাখতে হেমলক বিষপানে জীবন দিতে হয়েছে জ্ঞানপ্রেমিক দার্শনিক সক্রেটিসকে। এমনি করে সত্যের সাধনায় মহাপুরৰষগণ জীবনকে যেভাবে গৌরবান্বিত করে গেছেন তেমনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন সততার মহান আদর্শ।

বর্তমান অবস্থার প্রেৰাপটে সততার মূল্যায়ন : সততা বাস্তব জীবনের একটি মহত্তর দিক হলেও বাস্তব জীবনে বিশেষত দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে তা যথার্থ মর্যাদা লাভ করতে পারছে না। সততা পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে। ফলে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিকেই তারা প্রাধান্য দিয়ে নানা রকমের অত্যাচার, অনাচার ও দুর্নীতি করে চলেছে। অসততার প্রতি মানুষের তেমন প্রতিবাদ বা বিরূ পতা দেখা যাচ্ছে না। ফলে ঘরে-বাইরে সর্বত্রই আজ মনুষ্যত্বের দীনতার চিত্র। আমাদের যুবসমাজ প্রতিনিয়ত অবৰয়ের দিকে অগ্রসরমান। একদিকে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-কলহ, অন্য দিকে অর্থনৈতিক দুর্দশা, শিৰাজগতে নৈরাজ্য, সমাজসেবার নামে নিজের স্বার্থ হাসিল এবং স্বেচ্ছাচারিতা যুবসমাজকে বিপথগামী করছে। সমাজে সমাজবিরোধীর যে সম্মান, যে প্রতিপত্তি, সেখানে একজন জ্ঞান, সৎ মানুষের মূল্য তুচ্ছ। সততা সেখানে লাঞ্ছিত, অসহায়। বিবেক সেখানে বিবর্জিত। আজ তাই মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধও গৌণ হয়ে উঠেছে। বস্তুত সমাজের সর্বস্তরে আজ যে সততা, সত্যবাদিতা ও মূল্যবোধের অভাব, তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া যুবকদের মাঝে প্রতিনিয়ত বিস্তৃত হচ্ছে।

আমাদের কর্তব্য : জীবনকে অবশ্যই সততার মাধুর্যে মন্ডিত করতে হবে। অন্যায়ের মাধ্যমে বা অবৈধ উপায়ে কেউ যতই বিত্তশালী হোক না কেন তা যে পাপ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অসত্যের পরাজয় আসবেই ও ন্যায়ের পথ চির উজ্জ্বল থাকবেই। সৎ ব্যক্তি নৈতিক শক্তির বলে বলীয়ান। পরোপকারই তার জীবনের ব্রত। কখনো সে অন্যের ৰতির চিন্তা করেন না। মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় সততার গুণে। যে সমাজে সত্য ও সততার মূল্যায়ন নেই, সেই সমাজে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সেই সমাজ ক্রমে নানা পাপাচারে অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকে। সেজন্য সততা ও সত্যবাদিতার অনুশীলন করতে হবে এবং জীবনে তার প্রতিফলন ঘটিয়ে যথার্থ মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে হবে। বর্তমান অবস্থার প্রেৰাপটে সমাজে আজ সৎ মানুষের প্রয়োজন খুব প্রকট। তাই আমাদের সকলের প্রয়োজন সত্যের সাধনা।

উপসংহার : সততা সুন্দর, সততা মহান। আমাদের চরিত্রকে মহিমান্বিত করার জন্য, জীবনকে সফলতায় ভরে দেওয়ার জন্য সততার চর্চা অপরিহার্য। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সততার পরিচয় দিতে ছোটবেলা থেকেই সৎ থাকার অভ্যাস গঠন করতে হবে। সততার অনুশীলন করতে হবে।

৩৬ সংবাদপত্র

ভূমিকা : বর্তমানে সংবাদপত্র মানুষের অপরিহার্য সঙ্গী। প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, বিরহ-ব্যথার বার্তা বহন করে সংবাদপত্র। প্রতিদিন সারা বিশ্বের বার্তাসহ সংবাদপত্র

আমাদের দ্বারে দ্বারে উপনীত হয় বলে, মানবজীবনের সঙ্গে সংবাদপত্রের এত বেশি সম্পৃক্ততা। সংবাদপত্র হলো সারা বিশ্বের একটা দর্পণস্বরূ প। বিশ্বের কোথায় কী ঘটছে এক পলকে তা ভেসে ওঠে আমাদের চোখের সামনে সংবাদপত্রের মাধ্যমে। গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বহু দল ও মতের ধারক-বাহক হিসেবে সংবাদপত্র সরকার ও জনগণের মধ্যে রচনা করে সেতুবন্ধ।

সংবাদপত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : সংবাদপত্র সর্বপ্রথম কোথায় উৎপত্তি হয়েছিল তার সঠিক তথ্য অজানা। তবে ধারণা করা হয়, চীন দেশে সর্বপ্রথম সংবাদপত্রের সূচনা ঘটে। পাশ্চাত্য দেশগুলোর মধ্যে সম্ভবত ইতালি প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করে। তবে চীনেই প্রথম কাগজ ও মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে মোগল শাসনামলে রাজ্য পরিচালনার সুবিধার্থে হস্তলিখিত সংবাদপত্রের প্রচলন ঘটেছিল। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের ফলে সংবাদপত্র জগতে অভাবনীয় পরিবর্তন আসে।

বাংলাদেশে সংবাদপত্রের ইতিহাস : বাংলাদেশে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে 'বেঙ্গাল গেজেট' নামে সর্বপ্রথম সর্বসাধারণের জন্য সংবাদপত্রের প্রচলন করা হয়। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর মিশন থেকে বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র 'দিগদর্শন' ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। বাঙালি পরিচালিত প্রথম পত্রিকা 'সাপ্তাহিক গেজেট' গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় প্রথম দৈনিক ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৩১ সালে সাপ্তাহিক এবং ১৮৩৯ সালে দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদপত্রের প্রকাশিত বিষয়সমূহ : সংবাদপত্রে বিশ্বের খবরাখবরের পাশাপাশি রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক পরিস্থিতি প্রভৃতি নিয়ে নিয়মিত ফিচার, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। চিঠিপত্র, ব্যবসা-বাণিজ্যের হালচাল, শেয়ারবাজার, নানা বিজ্ঞাপনও সংবাদপত্রে সন্নিবেশিত হয়। এছাড়া আজকাল বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন, ফটো ফিচার সংবাদপত্রে নতুন মাত্রা এনেছে। নিয়মিত খবরাখবর পরিবেশনের পাশাপাশি বর্তমানে সংবাদপত্রগুলোতে থাকে নানা সাপ্তাহিক আয়োজন।

আধুনিক জীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব : আধুনিক জীবনে সংবাদপত্রের গভীর ও ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সংবাদপত্র একদিকে যেমন জাতীয় তেমনি আন্তর্জাতিক সংবাদ পরিবেশন করছে। ফলে এর মাধ্যমে জনগণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা তথ্যের সাথে পরিচিত হয়। আবার এর সম্পাদকীয় মন্তব্য তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এভাবে জনগণ নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়। ফলে জনমত গঠনের সুযোগ পাওয়া যায়। সুষ্ঠুভাবে গণতন্ত্র পরিচালনায় সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে জনসাধারণ রাষ্ট্রের নীতি ও কর্মপন্থার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে, আবার সংগঠনমূলক আলোচনা করার সুযোগও পায়।

বাংলাদেশের সংবাদপত্র : বর্তমানে বাংলাদেশে ১৮০০-এর বেশি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এদের মধ্যে দৈনিক ইত্তেফাক, প্রথম আলো, যুগান্তর, সমকাল, দৈনিক ইনকিলাব, সংবাদ, জনকণ্ঠ, আজকের কাগজ, ভোরের কাগজ, দিনকাল, মানবজমিন, যায়যায়দিন, নয়াদিগন্ত, বাংলাদেশ অবজারভার, মর্নিং নিউজ ইত্যাদি পত্রিকা এবং বেগম, বিচিত্রা, আনন্দভুবন, আনন্দ আলো, সচিত্র বাংলাদেশ, রোববার, সপ্তাহের বাংলাদেশ, অনন্যা, অন্যদিন, আনন্দধারা ইত্যাদি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা বিশেষ উলেরযোগ্য।

জাতীয় জীবনে সংবাদপত্রের গুরবত্ব : একটি জাতির ভাগ্য পরিবর্তনে সংবাদপত্র গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সংবাদপত্র মানুষকে বিশ্ব-পরিস্থিতি ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করে আধুনিক যোগ্য নাগরিকে পরিণত করে। দেশ-দেশান্তরের রাজনীতি-অর্থনীতি, সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়কসংক্রান্ত আলোচনা তার চিন্তার বিকাশ ঘটিয়ে সৃষ্টিশীল কাজে উদ্বুদ্ধ করে। অশিৰিত, অসচেতন মানুষের দেশে গণতন্ত্র কখনও সফল হতে পারে না। সংবাদপত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ভালোমন্দ দিক বিশেরষিত ও আলোচিত হয়, যা দেশের নাগরিককে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে বা পছন্দের রাজনৈতিক দল বেছে নিতে সহায়তা করে। সংবাদপত্র দেশে নানা নীতিনির্ধারণী বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করে; সে সম্পর্কে বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের মতামত প্রকাশ করে। সরকার ও বিরোধী দলের ভালোমন্দ কাজ নিয়ে সমালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা দেখেছি আমাদের ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংবাদপত্র কি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করছে। উলিরখিত প্রতিটি ৰেত্রেই সংবাদপত্রসমূহ জনমত গড়ে তুলে এ দেশবাসীকে নানা আন্দোলনে সক্রিয় করে তুলেছে।

সংবাদপত্রের ৰতিকর দিক : সংবাদপত্রের মধ্যে মহত্তর সম্ভাবনা রয়েছে। অথচ জনসেবার মহৎ উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে সংবাদপত্রের পরিচালকবৃন্দ ও সাংবাদিকগণ দলগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধির মানসে সংবাদপত্রকে কখনো কখনো হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। জাতীয় জীবনে এর প্রভাব তখন মারাত্মক হয়ে ওঠে। আবার দেশের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা, কোন্দল ও বিদ্বেষের ভাব, নানা রূ প কুৎসা ও মিথ্যা রটনার জন্য অনেক ৰেত্রে দায়িত্বজ্ঞানহীন সংবাদপত্রই দায়ী। ক্ষুদ্র তুচ্ছ স্বার্থ সাধনের বশবর্তী হয়ে সাংবাদিকগণ যখন বিবেক বিসর্জন দেয়। তখন সংবাদপত্র জনসাধারণের অকল্যাণের নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়? স্বার্থবুদ্ধির ফলে সাংবাদিকরা মিথ্যাচার করলে এর পরিণাম কী ভয়াবহ হতে পারে তা অনুমান করা যায় না।

উপসংহার : বর্তমানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে সংবাদপত্র গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে আধুনিক যুগে স্যাটেলাইট, টিভি, ইন্টারনেট প্রভৃতি সংবাদপত্রের প্রতি যোগী হয়ে উঠেছে। আজ যে ঘটনা ঘটছে তা মুহূর্তেই মানুষ জানতে পারছে বিবিসি কিংবা অন্য কোনো সংবাদমাধ্যমে, যা খবরের কাগজে পাওয়া যায় পরের দিন। তাই বলে ইলেকট্রনিক মিডিয়া সংবাদপত্রের জন্য হুমকিস্বরূ প তা ভাবার কোনো অবকাশ নেই। বরং এগুলো প্রায়ই সংবাদপত্রের সহায়করূ পে কাজ করে। তাই আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শীর্ষে অবস্থানকারী দেশগুলোতে সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা বরং তুলনামূলকভাবে বেশি। সংবাদপত্র সচেতন মানুষ

গড়ার কাজে একনিষ্ঠ থাকে, সুবিধাবাদী মানুষের হাতিয়ারে পরিণত না হয় তাহলে এর প্রয়োজন কখনও শেষ হবে না।

৩৭ একটি শীতের সকাল

ভূমিকা : বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। পালাক্রমে ছয়টি ঋতু এসে বাংলাদেশকে নব নব রূ পে সাজায়। সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে তারা আসে আর যায়। বসন্ত ঋতুর আগে এর আগমন ঘটে। প্রকৃতিকে কুয়াশার চাদরে জড়িয়ে নিতে আবির্ভাব ঘটে শীতকালের। আর শীতের সকাল এক বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চার করে মানবমনে। এ সময় প্রকৃতি রিক্ততার সন্ন্যাসী রূ প ধারণ করে যেন। কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে মানুষের মনে অলসতা ভর করে। চাদর মুড়ি দিয়ে শীতকে দূরে ঠেলার প্রগাঢ় চেষ্টায় লিপ্ত মানুষ বারবার ব্যর্থ হয়। ধরণীর বুকে শীতের আগমন আনে বৈরাগ্যের সুর। এর সাথে সাথে শীতের সকালও একই রূ প পরিগ্রহ করে। তাই বুঝে কবি বলেন–

“হিম হিম শীত শীত
শীত বুড়ি এলো রে,
কনকনে ঠান্ডায়
দম বুঝি গেলো রে।”

শীতকালের বৈশিষ্ট্য : ষড়ঋতুর মধ্যে পঞ্চম ঋতু হলো শীতকাল। পৌষ ও মাঘ এ দুই মাস শীতকালের ব্যাপ্তি থাকে। ইংরেজি বর্ষপঞ্জি অনুসারে মোটামুটি নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীত অনুভূত হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালের বিপরীত অবস্থানে থাকে শীতকাল। বর্তমান সময়ে শীতকালে আবার বৃষ্টি হতেও দেখা যায়। প্রবল শৈত্যপ্রবাহে দেশের উত্তরাঞ্চলসহ বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য সাধারণ মানুষের প্রাণহানিও ঘটে।

শীতের সকালের স্বরূ প : কুয়াশার চাদরে মোড়া শীতের সকাল হাড় শীতল করা ঠান্ডা নিয়ে দেখা দেয়। এ সময় এক ফালি রোদ সকলের কাছে বহুল প্রতীৰিত হয়ে ওঠে। গ্রাম হোক কিংবা শহর, সব জায়গাতেই শীতের রয়েছে একটি ভিন্ন আমেজ। শীতের সকালে মানুষের মাঝে এক অজানা অলসতা ভর করে। লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকাতেই যেন তখন স্বর্গীয় সুখ অনুভূত হয়। কর্মব্যস্ত মানুষ ঘুমের জগতে হারিয়ে যায়। কুয়াশার অন্ধকারে সূর্যদেবতার দেখা পাওয়া ভার। তাই সকালের উপস্থিতি টের পাওয়াও কষ্টকর। কিন্তু জীবনের বাস্তবতা শীতকেও দূরে সরিয়ে দেয়। তাই আড়মোড়া ভেঙে উঠতেই হয় সকলকে। নিজেকে তৈরি করে নিতে হয় কাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। শীতের সকালে শান্ত প্রকৃতি ভোরের আলো–আঁধারিতে রহস্যময় রূ প ধারণ করে থাকে। তবে ধীরে ধীরে শীতের কুয়াশা কাটতে থাকে। অতঃপর শীতের আকাশে মুচকি হাসি নিয়ে দেখা দেয় রবির কিরণ। এর মধ্যেই শীতের সকালের অপার আনন্দের ছোঁয়া পাওয়া যায়। তাই কবি বলেন–

“ঋতুর দল নাচিয়া চলে
ভরিয়া ডালি ফুল ও ফলে,
নৃত্যলোকে চরণতলে মুক্তি পায় ধরা
ছন্দে মেতে যৌবনেতে রাঙিয়া উঠে জ্বরা।”

শীতের সকালে প্রকৃতি ও প্রাণীর অবস্থা : শীতের সকালে প্রকৃতি ও প্রাণীর মধ্যে এক ভিন্ন আমেজ লৰ করা যায়। শীতের সময় দিন ছোট এবং রাত বড় হয়। সকাল হয়েও যেন হয় না। মানুষ, জীবজন্তু, পাখ–পাখালি শীতের বেলায় সূর্যের প্রত্যাশায় প্রহর গুনতে থাকে। ঠান্ডায় জড়সড় হয়ে থাকতে দেখা যায় সবাইকে। কুয়াশার জালে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে চারদিক। শিশির ঝরতে থাকে

অবিরাম। কেবল মানুষই নয়, প্রাণীরাও বাইরে বের হতে চায় না। আড়ষ্ট হয়ে থাকে শীতের প্রকোপে।

গ্রামের প্রকৃতিতে শীতের সকাল : শীতের সকালের প্রকৃত আনন্দ গ্রামীণ জীবনেই খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার গ্রামগুলোতে শীতের সকাল বেশ মনোরম হয়। গ্রামের মাঠে মাঠে শীতের প্রভাব বেশ চোখে পড়ে। শীতের কুয়াশা ভেদ করে নিজ নিজ গৃহপালিত প্রাণীদের নিয়ে বের হয় গ্রামের কর্মঠ মানুষেরা। সূর্যের দেখা পাওয়া মাত্রই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রোদ পোহাতে শুরব করে। গ্রামের মানুষেরা খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে শীতকালে উষ্ণতা খুঁজে ফিরে। আগুনের চারপাশে বসে তারা তাপ পোহাতে থাকে। তবে গ্রামীণজীবনে দারিদ্র্যের উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। বস্ত্রাভাবে দরিদ্র পরিবারের অনেক মানুষের শীতে নাকাল অবস্থা হয়। গ্রামের অনেক প্রবীণ ব্যক্তির প্রাণহানিও ঘটে থাকে শীতের প্রকোপে।

শীতের সকালে গ্রামের সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত হলো পিঠা–পুলি খাওয়ার মুহূর্ত। গাছে গাছে খেজুরের রসের হাঁড়ি ঝুলিয়ে রাখতে দেখা যায়। সে হাঁড়ি নামালে ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা রস খাওয়ার লোভে ছুটে ছুটে আসে। এ রস দিয়ে নানা রকম পিঠা বানানো হয়। বাড়িতে বাড়িতে মা, চাচি কিংবা দাদিরা সকালবেলাতেই পিঠা তৈরি করতে বসে। অনেকে শীতের ছুটি উপভোগ করতে শহর থেকে ছুটে যায় গ্রামে। শীতের সকালে নানা পিঠা খাওয়ার চিত্রকে তুলে ধরতেই মনে হয় কবি বলেছেন–

> "পৌষ মাসে পার্বণে খেতে বসে খুশিতে বিষম পেয়ে
> আরও উলরাস বেড়েছে মনে মায়ের বকুনি খেয়ে।"

শহুরে জীবনে শীতের সকাল : শহুরে জীবনে শীতের সকালের রূ প ভিন্ন হয়ে থাকে। গ্রামীণ জীবনের আবেদন এখানে পাওয়া যায় না। ইট–কাঠ–পাথরের শহরে শীতের সকালের আমেজ একদম আলাদা। শহরে দেখা যায় বারান্দায় বসে রোদ পোহানোর দৃশ্য কিংবা গরম চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে খবরের কাগজ পড়ার দৃশ্য। লেপ জড়ানো কর্মব্যস্ত মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের পরেও আরও একটু ঘুমিয়ে নিতে চায়। কিন্তু জীবিকার টানে তকে আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠতেই হয়। নিজ নিজ কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য গরম কাপড় পরিধান করে প্রস্তুত হতে হয় সকলকে। ঘাসের ওপরে টলমল করতে থাকা শিশির বিন্দু শহরে তেমন একটা দেখা যায় না। খেজুরের রস কিংবা নানা স্বাদের পিঠার সুঘ্রাণ এখানে খুঁজে পাওয়া বিরল। এখানে কেবল কাকের কর্কশ আওয়াজ, যানবাহনের শব্দ এবং মানুষের কোলাহলমিশ্রিত যান্ত্রিক জীবনই দেখা যায়।

উপসংহার : শীতের সকাল অন্য সব ঋতুর চেয়ে একদম আলাদা। শীতের রিক্ততা প্রকৃতির সবুজকে ছিনিয়ে নিলেও দিয়ে যায় ঋতুরাজ বসন্তের আগমনী বার্তা। কুয়াশার চাদরে ঢাকা গোটা প্রকৃতি শীতকে যে একেবারেই উপভোগ করে না, তা ঠিক নয়। শীতের আবেদন চিরন্তন। হিমঠান্ডার কনকনে অনুভূতি প্রতিটি মানুষকে আলোড়িত করে। তাই শীত চলে গেলেও এর রেশ থেকে যায় এবং প্রকৃতি বসন্তের আগমন হেতু অপেৰমাণ হয়। তাই তো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন–

> 'এসেছে শীত গাহিতে গীত বসন্তেরি জয়,
> যুগের পরে যুগান্তরে মরণ করে লয়।

—: সমাপ্ত :—